অনেক আঁধার পেরিয়ে

মুহাম্মদ জাভেদ কায়সার ﷺ

সমর্পণ

ইনবক্সে প্রশ্ন : 'সবকিছুর মধ্যে ধর্ম টেনে আনতে হবে কেন আপনাকে?'
আমি ক্লান্ত গলায় উত্তর দিই, 'কারণ আমি মুসলিম। আমার ধর্ম ইসলাম।'
'আপনার কি মনে হয় আমি মুসলিম না? কই, আমি তো রাজনীতি, খেলা, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ে ধর্ম টেনে আনি না। ইসলামের নাম দিয়ে সবকিছুতে খুঁত-ধরা আপনাদের মতো মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে—এটাই সত্য।'
এড়িয়ে যেতে গিয়েও ফিরে আসি আমি। খানিক চিন্তা করে আবার ম্যাসেজ পাঠাই : 'কিয়ামাত বিশ্বাস করেন? পাপ-পুণ্যের হিসাব?'
-'বিশ্বাস না করার কী আছে? অবশ্যই বিশ্বাস করি। মুসলমান-মাত্রই করে।'
-'কীসের মাপকাঠিতে সেদিন বিচার হবে আমাদের? আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপি? রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনা? বাংলাদেশ বনাম সৌদি আরব?'
আমি লিখে যাই...
যদি 'ইসলাম বনাম অন্য ধর্ম'-ই আল্লাহ তাআলার বিচারের মানদণ্ড হয়, কেন সবকিছুতে সবার আগে ধর্মকেই টেনে আনব না আমি? একটু বুঝিয়ে বলবেন?
এই প্রশ্নের উত্তর পাই না আমি।
প্রতীক্ষা বেড়ে চলে। সময় পার হয়ে যায়।
আমি একটি উত্তরের আশায় থাকি শুধু!

অনেক আঁধার পেরিয়ে

মুহাম্মদ জাভেদ কায়সার رحمه الله

“মুমিনদের কি সময় হয়নি—আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হবার?”

[সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১৬]

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা/৮
পৃথিবীর পথে পথে/১২
সুখের সংজ্ঞা/১৭
টুকরো টুকরো গল্প/২০
আলেয়ার পিছে/২৫
নিয়ামাত/২৮
ঠকাচ্ছি কাকে?/৩২
এসো তবে ফিরে/৩৮
সালাত/৪৬
অধঃপতনের ব্যাকরণ/৫০
ব্যর্থানুবাদ সংকলন/৫৫
মোহ/৬০
স্মরণিকা/৬৩
হৃদয়ে কা'বা/৬৮
বাইতুল্লাহ'র মুসাফির/৭৫
আত্মঘাতী অবহেলা/৮০
সম্মান সমীকরণ/৮৫
কুরআনের ছায়াতলে/৮৯
Know Your Heroes/৯৪
সত্যের ঋণ/১০০
অপ্রিয়-কথন/১০৬
ধর্ম যার যার, বুঝ-ও তার তার/১১৩
কাছে আসার গল্প?/১১৭
অগ্ন্যুৎসব/১২২
ট্রোজান হর্স/১২৭
এক উম্মাহ, এক দেহ?/১৩০
সুন্নাতাল্লাহ/১৩৬
নিপাতনে সিদ্ধ/১৩৮
অনুসরণীয় পথিকৃৎ/১৪৩
আত্মসমালোচনা অনুচ্ছেদ/১৫০
পরিবর্তিত জাভেদ কায়সার/১৫৭
ছিড়ে যায় অজস্র শেকল/১৬০
আমি জানি না/১৬৭
তাঁর মুখাপেক্ষী/১৭০
মুছে যায় সব রঙ/১৭৩
ভালো মৃত্যুর বেশ কিছু লক্ষণ/১৭৭
হারিয়ে-পাওয়া/১৮১
মধুরেন সমাপয়েত/১৮৪
পরিশিষ্ট/১৮৭
লেখক-পরিচিতি/১৮৮

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-এর, যিনি আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবি ﵃-দের ওপর।

মুহাম্মদ জাভেদ কায়সার ভাইকে বই লেখার কথা বলেছিলাম গত বছর। সম্ভবত বছরের এ সময়টাতেই। ভাইয়ের লেখার হাত ভালো ছিল। চাইলে এখনকার অনেক বেস্টসেলার লেখকের চেয়ে ভালো লিখতে পারতেন। কিন্তু সরাসরি না করে দিলেন। মানুষের প্রশংসা ও মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। রিয়ার ভয় করছিলেন। 'আমি আমার নিজেকে চিনি'—অনেকটা এ ধরনের উত্তর দিয়েছিলেন আমার প্রশ্নের জবাবে। এ উত্তরের পর আর যুক্তিতর্কের তেমন সুযোগ থাকে না, তাই আমিও তখন ক্ষান্ত দিয়েছিলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় আজ তার অবর্তমানে তার লেখাগুলো সংকলন ও সম্পাদনা করতে হলো। গত কয়েকমাস ধরে বারবার, থেকে থেকে ভাইয়ের অনুপস্থিতির বিষয়টা নাড়া দিয়েছে। তবে তার অনুপস্থিতি সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভব করেছি বইয়ের কাজ করতে গিয়ে। বইটা যদি অন্য কারও লেখা নিয়েও হতো তবুও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন অনেক বিষয় সামনে এসেছে যেগুলোর ক্ষেত্রে, তার সাথে আলোচনা করতে এবং তার পরামর্শ নিতেই হয়তো সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম। পুরো প্রক্রিয়াতে-যে মানুষটার পরামর্শ ব্যক্তিগতভাবে আমার সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল, তাকে ছাড়া কাজটা করা সহজ ছিল না। এবং সাফল্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

জাভেদ ভাই লিখেছেন প্রচুর। নানা বিষয়ে, নানা উপলক্ষে। এত লেখার মধ্য থেকে কেবল একটা বইয়ের জন্য লেখা বাছাই করার কাজটা সহজ ছিল না। তবে আমার মনে

হয়েছে তার সব লেখালেখির মধ্যে অন্তর্নিহিত মূল সুরটা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বদলানোর। পাশাপাশি তার লেখায় ফুটে উঠত চারপাশের মানুষের ব্যাপারে দায়িত্ববোধ, তাদের ভুলগুলো সংশোধন করার, সৎকাজে উৎসাহ, মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার সহজাত ইচ্ছে। অনেক-আঁধার-পেরিয়ে যে সত্যের খোঁজ তিনি পেয়েছিলেন, তার আলো অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে কাজ করত। এ অর্থে বলা যায় যে, তার সব লেখার মূল সুর ছিল পরিবর্তনের—নিজের চিন্তা, জীবন ও পারিপার্শ্বিকতাকে প্রতিনিয়ত আরও বেশি করে ইসলামের ছাঁচে সাজানোর।

পরিবর্তনের এ স্রোতের শক্ত উপস্থিতি ছিল মুহাম্মদ জাভেদ কায়সারের জীবনেও। যারা তাকে চিনতেন; বাস্তব জীবনে কিংবা লেখালেখির মাধ্যমে—তারা জানেন যে, তার জীবনে বড়ো ধরনের একটা পরিবর্তন এসেছিল, এবং এ পরিবর্তনের কারণ ছিল ইসলাম। কিংবা বলা যায়, ধর্ম ও ধর্মপালনের ব্যাপারে সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও লোকজ-চিন্তা থেকে বের হয়ে এসে মূল উৎস থেকে যখন তিনি ইসলামকে জানতে শুরু করলেন, যখন চেষ্টা করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মের মুসলিমদের উদাহরণ অনুযায়ী ইসলাম মানার। তখন তার চিন্তা-চেতনা, জীবন ও জীবন-দর্শন আমূল বদলে গেল। তার জীবনের মতোই এ পরিবর্তন প্রতিফলিত হলো তার লেখায়ও। জাভেদ কায়সারের লেখাগুলো একইসাথে তার পরিবর্তনের অংশ এবং ফসল।

নিজেকে ভেঙে আবার গড়ার এ অভিজ্ঞতা জাভেদ কায়সারের একার না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময় থেকে যুগে যুগে এ ধরনের পরিবর্তন হয়ে এসেছে। আজও আমাদের মাঝে এমন অনেক পরিবর্তনের গল্প আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে জাভেদ কায়সারের পরিবর্তনের গল্পটার কিছু বিশেষত্ব আছে, যে কারণে তার লেখা নিয়ে এই আয়োজন। পরিবর্তনের আগে ও পরে তিনি সমান-তালে লিখে গেছেন। যার ফলে অন্ধকার থেকে আলোতে ফেরার এ যাত্রার অনানুষ্ঠানিক একধরনের দিনলিপি তার লেখায় পাওয়া যায়। খুব কাছ থেকে পরিবর্তনের এ পথচলা দেখার একটি সুযোগ পাওয়া যায় তার লেখা থেকে।

আরেকটি বিশেষত্ব হলো তার গল্পটা আমাদের সময়ের, আমাদেরই গল্প। আমাদের সামনে আজ সবদিক থেকে ক্রমাগত তুলে ধরা হয় জীবন ও সফলতার গৎবাঁধা এক সংজ্ঞা। এখানে মানব অস্তিত্বের সাফল্য মাপা হয় ডিগ্রি, চাকরি, স্যালারি, গাড়ি, বাড়ি, স্ট্যাটাস, ক্যারিয়ার, সামাজিকতা, প্রথা-প্রচলন, টাকা আর তাক-লাগানোর এক যান্ত্রিক সমীকরণে। এ সংজ্ঞা, এ সমীকরণ প্রত্যাখ্যান করলে কপালে জোটে উন্মাদ, উগ্র কিংবা অবুঝ হবার অপবাদ। কিন্তু বহুল চর্চিত, চেনা, চকচকে এবং অন্তঃসারশূন্য এ সংস্করণের বাইরেও যে সাফল্যের অন্য এক ব্যাখ্যা আছে, বেঁচে থাকার ভিন্ন পথ

আছে তা আমাদের চোখের আড়ালে থেকে যায়। কিংবা কখনও চোখের সামনে চলে আসলেও তড়িঘড়ি করে আবার আমরা সেটাকে আড়ালে পাঠিয়ে দিই। আড়ালে-থাকা কিংবা আড়াল-করে-রাখা সেই জীবনের কিছু ছবি, কিছু টুকরো টুকরো বর্ণনা পাঠক পাবেন পরিবর্তিত জাভেদ কায়সারের লেখাগুলোতে।

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হলো, এ গল্পের শেষটুকু আমাদের জানা। অসমাপ্ত কোনো পথের অভিযাত্রীকে আমরা অনুসরণীয় হিসেবে উপস্থাপন করছি না। বরং আঁধার পেরিয়ে আসার স্বপ্ন-দেখা মানুষদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক হিসেবে তাদেরই সময়ের, তাদেরই মতো একজন মানুষের রূপান্তরের গল্পগুলো তুলে ধরছি। আল্লাহ চাইলে জাভেদ কায়সারের লেখাগুলো আরও অনেকের পরিবর্তনের উপলক্ষ হবে।

সম্পাদনার সময় লেখাগুলোকে অপরিবর্তিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। বইয়ের উপযোগী করে তোলার জন্য একই বিষয়ের বিভিন্ন ছোটো ছোটো লেখাকে আনা হয়েছে এক শিরোনামের অধীনে। বইয়ের সম্পাদনা এবং বিন্যাসের পুরো প্রক্রিয়ায় আমরা চেষ্টা করেছি লেখাগুলোকে এমনভাবে সাজাতে যাতে করে পরিবর্তনের পথে লেখকের যাত্রায় পাঠক নিজেকে আবিষ্কার করতে পারেন লেখকের সহযাত্রী হিসেবে। এবং অনুভব করতে পারেন এ পথের সুখ-দুঃখ, চড়াই-উতরাইয়ের অভিজ্ঞতাগুলো।

লেখকের নিজের গল্পের শেষ অধ্যায়ের বর্ণনা স্বাভাবিকভাবেই তার লেখায় উঠে আসেনি। এ অংশটুকু পাঠক পাবেন পরিশিষ্ট এবং লেখক-পরিচিতি-তে। ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য আমরা বইয়ের প্রথমে না এনে লেখক-পরিচিতি তাই এনেছি বইয়ের একদম শেষে।

এ বইয়ের পেছনে অনেক ভাই-বোনের সময়, শ্রম ও আবেগ জড়িয়ে আছে। আল্লাহ তাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভাইয়ের পরিবারকে যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ আযযা ওয়া যাল তাদের অন্তরগুলোকে প্রশান্ত করুন, উত্তম প্রতিদান দিন।

ইন শা আল্লাহ জাভেদ ভাই উত্তম অবস্থায় পৃথিবী ছেড়ে তার মালিকের কাছে গেছেন। আল্লাহ আমাদের ভাইকে জান্নাত দান করুন, তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ আর-রহমানুর রহীম তার কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন। আমরা আমাদের রবের ব্যাপারে সুধারণাই রাখি, আমরা আমাদের রবের কাছ থেকে সর্বোত্তমটাই আশা করি। আল্লাহ ভাইয়ের কাজগুলো তার জন্য আমলে যারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন। তার

কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন।

মুহাম্মদ জাভেদ কায়সারের গল্পের শেষটা আমরা জানি। কিন্তু আমাদের নিজেদের গল্পগুলো এখনও অসমাপ্ত। আমরা নিশ্চিতভাবে কেবল এটুকু জানি যে, অবধারিতভাবেই একদিন আমাদের সবার গল্প শেষ হবে। ভয়ের ব্যাপারটা হলো, শেষটা কেমন হবে তা আমাদের জানা নেই।

এ বই সংকলন ও প্রকাশের পেছনে অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, পাঠককে একটি প্রশ্ন স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এমন একটি প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজে বের করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবীয় অগোছালো চিন্তার ঝঞ্ঝাটে তৈরি কোনো প্রশ্ন না। সাত আসমানের ওপর থেকে আসমান ও জমিনের মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল-হওয়া-প্রশ্ন ,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

> "মুমিনদের কি সময় হয়নি—আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হবার?"[১]

সব আনন্দ বিলুপ্তকারী মৃত্যুর মুখোমুখি হবার আগে এ প্রশ্নের সঠিক জবাব আমাদের দিতে হবে। তার ওপরই নির্ভর করবে আমাদের নিজ নিজ গল্পগুলোর পরিসমাপ্তি। ছকে-বাঁধা যান্ত্রিক জীবন আর অনুভূতিকে অবশ করে দেওয়া ব্যস্ততা ও বিক্ষিপ্ততার মাঝে একটু কি সময় হবে আমাদের, প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করার?

এখনও কি সময় হয়নি—আল্লাহর স্মরণে অন্তরগুলো বিগলিত হবার?

আসিফ আদনান

রবিউল আউয়্যাল ১৪৪১, নভেম্বর ২০১৯

---

[১] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১৬

পৃথিবীর পথে পথে

১

বাবা মারা গেলেন ১৯৯০ সালের ৩০ শে এপ্রিল ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে।

ওই সময়টা থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত সময়টার কোনো স্মৃতিই আমার মনে নেই। কোথায় ছিলাম তখন, মা কী করছিলেন, তিথি কার কাছে ছিল—অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারি না আমি। শুধু মনে আছে—প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল আমার। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলাম সকাল নয়টা বাজে। স্মৃতির শুরু সেই দেয়াল ঘড়ির সময় দেখেই।

সরকারি কলোনির মানুষদের নিজেদের মধ্যে দারুণ আন্তরিকতা থাকে। প্রত্যেকটা পরিবারের সাথে প্রত্যেকটা পরিবারের নাড়ির টান। মাসজিদের মাইকের শব্দ কানে এল, বাবার মৃত্যুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে। "বি-৬৪/এফ-৯ নিবাসী মুহাম্মাদ নুরুজ্জামান সাহেব আজ ভোরে ইন্তেকাল করেছেন"—এই কথা ছড়িয়ে পড়তে তাই খুব বেশি সময় লাগেনি। স্রোতের মতো মানুষজন আসতে শুরু করল একটা সময়ে।

পুরো বাসা ভর্তি কলোনির মানুষ গিজগিজ করছে। অনেকেই কোলে তুলে নিচ্ছেন আমাকে, তিথিকে। মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার কথাও বলছিলেন অনেকে। খেলার সাথি বন্ধুরা কেমন করে যেন তাকাচ্ছিল আমার দিকে।

বাবাকে বড়ো রুমের ফ্লোরে একটা পাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা তাকে। মাথার নিচে বালিশ ছাড়া শুয়ে-থাকা বাবার পাশে আমাদের দুই ভাই-বোনকে বসিয়ে দিয়ে গেলেন কেউ একজন। সামনের বিল্ডিংয়ের আনোয়ার ভাই কোথা থেকে এসে চাদর সরিয়ে বাবাকে দেখালেন আমাদের। রাতে

শোয়ার সময়ে পরা সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে তার। বাবার মুখে এক চিলতে হাসি লেগে ছিল! এই বিষয়টি নিয়ে সবাই খুব কথা বলেছিলেন সেদিন। নুরুজ্জামান সাহেবের মৃত্যু খুব কম কষ্টে হয়েছে, আল্লাহ্ তার ওপর প্রসন্ন, মুখে হাসি দেখেই মনে হচ্ছে আল্লাহ্র পছন্দের মানুষ ছিলেন তিনি—এই জাতীয় বিস্তর কথাবার্তা চলছিল। স্পষ্ট মনে আছে আমার।

তিথিকে রেখে খিদে পেটে উঠে গেলাম একসময়ে। বুঝতে পারছিলাম ঠিক—আমাদের ঘোর দুর্দিন আজ। কিন্তু এমন ঘোর দুর্দিনেও যে কারও খিদে লাগতে পারে—এটা সেদিন বুঝেছিলাম প্রথম। কাউকে খিদের কথা কিছু বলতেও ইচ্ছে করছিল না। "খিদে-লাগা-জনিত-অপরাধবোধ" মনে নিয়ে ঘরময় হেঁটে বেড়াতে লাগলাম। এই অপরাধবোধ থেকে আমাকে মুক্তি দিলেন নিচতলার ফয়সাল ভাইয়ার মা। আমাকে রীতিমতো টেনে নিয়ে গেলেন তাদের বাসায়। একটা গোটা ডিম ভেজে দিয়েছিলেন তিনি নাস্তায়। চেয়ারে বসিয়ে খালাম্মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফিসফিস করে বললেন, "নাস্তা খাও বাবা। সকাল দশটা বেজে গেছে। এতক্ষণ খালি পেটে থাকতে হয় না।"

কেন জানি চোখ ভেঙে কান্না পেল। বাবাকে নিজেদের বাসার ফ্লোরে শুইয়ে রেখে ঠিক তার নিচতলায় একটা গোটা ডিম ভাজি দিয়ে নাস্তা করার অপরাধবোধ থেকে কি?

জানা হয়নি আমার আজও!

শেষ রাতে বাবা'র বুকে ব্যথা অনুভব করা থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমরা সময় পেয়েছিলাম মাত্র ৩৫ মিনিট। একটা ছোটোখাটো 'গোছানো সংসার' আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছিল মাত্র ৩৫ মিনিটে।

লক্ষ-কোটি পরিবার আছে এই পৃথিবীতে, আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় যাঁদের ক্ষেত্রে সময়টুকু এরচেয়েও অনেক কম ছিল। অথচ আমরা কত দূর ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনায় ব্যস্ত, মগ্ন!

দীর্ঘমেয়াদী (জাগতিক) কিছু পরিকল্পনা করতে গেলেই জীবন-থেকে-নেওয়া সেই ভোরের শিক্ষার কথা মনে হয় আমার বারবার—"মাত্র ৩৫ মিনিট"! আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন!

২

বাবা মারা গিয়েছিলেন রমাদানের ঈদের ঠিক তিন দিন পর। সেবারই শেষবারের মতো বাবার হাত ধরে মার্কেটে গিয়ে ঈদের জামা কেনার আনন্দময় স্মৃতি। কী তুমুল উৎসাহে বাবার সাথে দোকানে যেতাম—ভাবলেই ভীষণ অবাক লাগে এখন!

কুরবানির ঈদের গরুর জন্য আমার প্রগাঢ় মমতা কাজ করত ছোটোবেলায়। অতি পছন্দের গরু জবাইয়ের পরে সারা দিন মন খারাপ থাকত আমার। বাবা মারা গিয়ে এই কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দিলেন আমাকে! ৯০ সালের কুরবানির ঈদে আমাদের কুরবানি দেওয়ার সামর্থ্য হলো না। সেই প্রথম বাবাহীন ঈদের মর্ম টের পাওয়া। খেলার সাথি সবাই যখন নিজেদের গরুকে ভূষি-খড় খাওয়াতে দারুণ ব্যস্ত, আমার তখন অখণ্ড অবসর। মতিঝিল এজিবি কলোনির বি-৬৪, এফ/৯ এর ফ্ল্যাটের বারান্দায় আমার তখন অলস বিকেল কাটছে।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। ১৯৯১ সালের রমাদানের ঈদ। ছোটোবেলা দেখেই হয়তো, ঈদে জামা-কাপড় কেনাকে ধর্মীয় নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ভাবতাম। বাবা বেঁচে নেই, তাই নতুন কাপড় কেনা হবে না, সংগত কারণেই আমাদের এবার ঈদ হবে না—এই কথা চিন্তা করে দিনমান চাপা-কষ্ট বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বন্ধুরা সবাই বাবা-মা'র হাত ধরে মার্কেটে যাচ্ছে। ছোটো বোনটিকে সাথে নিয়ে বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাদের আসা-যাওয়া দেখি আমি।

ঈদের দুদিন আগের বিকেলবেলা। নতুন কাপড়ের অভাবে তখন ঈদ না হওয়ার বিষয়ে ৯৮ শতাংশ নিশ্চিত আমি। বাকি ২ শতাংশে 'মধুর বাগড়া' দিলেন আমার মেঝো মামা। ঈদ নষ্ট হতে দিলেন না তিনি। আমাকে সাথে নিয়ে বের হলেন। মেঝো মামা তখন নতুন বিয়ে করেছেন মাত্র। খুব বেশি যে সচ্ছল ছিলেন না তিনি—সেটুকু ঠিক বুঝতে পারতাম। সেই অবস্থাতেও আমাকে নিয়ে গিয়ে চকোলেট কালারের একটি সুন্দর ফুলপ্যান্ট কিনে দিলেন। দীর্ঘ এই জীবনে সেই মাপের খুশি খুব বেশি হয়েছি বলে মনে পড়ে না আমার। সামান্য একটি ফুলপ্যান্টের অসামান্য স্পর্শে প্রবল আনন্দে কাটল আমার সে ঈদ!

তারপরের অনেক ক'টি বছর সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম সেই প্যান্টটিকে। এর মাঝে আরও অনেক প্যান্ট কেনা হলেও চকোলেট কালারের সেই ফুলপ্যান্ট-এর স্থান নিতে পারেনি কোনোটিই। খেলতে গিয়ে একবার হাঁটুর ওপরে ছিঁড়ে গেল। দোকানে গিয়ে তালি মেরে নিলাম। তালি-মারা সেই প্যান্টেই যাবতীয় আনন্দ আমার! কোথাও কোনো অনুষ্ঠানে যাবে হয়তো সবাই। ভালো প্যান্ট থাকতেও মহানন্দে হাঁটুর ওপরে তালি-মারা চকোলেট কালারের প্যান্ট পরে বাসার সবার আগে আমি রেডি।

আহা! বড়ো মায়ায় জড়িয়ে গিয়েছিলাম আমার চকোলেট কালারের ফুলপ্যান্টটির সাথে।

পুনশ্চ : ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে, বাসা পরিবর্তন করার সময় চকোলেট কালারের সেই ফুলপ্যান্টটি হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি!

৩

তীব্র রোদের মধ্যে হনহন করে হাঁটছে ছেলেটি। গন্তব্য ওয়ারি।

টিউশনি আছে দুপুর তিনটায়। পৌনে তিনটার মধ্যে পৌঁছতেই হবে। যেই স্টুডেন্টকে পড়ায় ছেলেটি—তার মা অতি ভয়ংকর প্রকৃতির। ভয়ংকর প্রকৃতির না হলে নেহায়েত দুপুর তিনটার সময় পড়ানোর কথা বলতেন না।

দুপুর তিনটা একটা অদ্ভুত সময়। এই সময়ে ভাত না খেয়ে কারও বাসায় যাওয়াটা রীতিমতো অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। উপায় ছিল না ছেলেটির। কলেজ শেষ করে বাসায় ভাত খেয়ে টিউশনিতে গেলে দুপুর তিনটা পার হয়ে যায়। গত মাসে বাসায় ভাত খেতে টিউশনিতে আসতে আসতে চার দিন লেট। মাসের শেষে হিসেব করে চার দিনের বেতন কেটে নিলেন সেই মহিলা! যৎসামান্য টাকার ভেতরে সেই চার দিনের বেতনও অনেক কিছু।

একরকম বাধ্য হয়েই দুপুরে না খেয়ে টিউশনিতে চলে যেতে হতো তাকে। স্টুডেন্টের বাসায় পৌঁছাল যখন সে—ঘড়িতে বিকাল তিনটা দুই মিনিট। শান্তির নিশ্বাস ফেলে কলিংবেল টিপতে গিয়ে থেমে গেল ছেলেটি। দরজায় বিশাল তালা ঝুলছে। নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও বেড়াতে চলে গেছেন তারা। এটা নতুন কিছু না। এর আগেও বেশ কয়দিন এসে ফিরে যেতে হয়েছে তাকে। কষ্টের বিষয় হলো—আজকের দিনেও তাকে লেট হিসেবে ধরা হবে! যদিও সে প্রায় নিশ্চিত—তিনটা বাজার আগেই বের হয়ে গেছেন তারা।

ক্লান্ত পায়ে রাস্তায় নামল ছেলেটি। বাইরে প্রচণ্ড গরম। এদিকে সকালের নাস্তা ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। খিদের আগুন জ্বলছে পেটে। অন্যান্য দিন এতটা ক্লান্ত লাগে না তার। কিন্তু আজ পা দুটো যেন চলছে না আর। পাশের 'বিসমিল্লাহ কনফেকশনারি' নামের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। পকেটে যেই টাকা আছে, তাতে একটা ঠান্ডা ড্রিংকস মিলবে না। তারপরেও সাহস করে একটা ড্রিংকস চাইল সে। কী মনে হতে দোকানদারকে টাকার অভাবের কথাটিও বলে ফেলল।

মাঝ বয়সের দোকানদার স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করল না ঘামে-নেয়ে-ওঠা ছেলেটিকে। বাকিতে একটা ঠান্ডা ড্রিংকস কপালে জুটল না তার। তীব্র কষ্ট আর অভিমান বুকে করে রাস্তার দিকে পা বাড়াতেই অন্ধকার হয়ে আসল ছেলেটির চারিপাশ। দীর্ঘ সময়ের খালি পেট, তীব্র গরমে অনেকক্ষণ হাঁটা, টাকার অভাবে একটা ঠান্ডা ড্রিংকস না খেতে পারার

কষ্ট—এত কিছুর ভার তার ছোট্ট শরীর বয়ে নিতে পারল না আর। দোকানের সামনেই জ্ঞান হারাল ছেলেটি...

১৮ বছর পরে সেই ছেলেটি আজকে এসি রুমের ভেতর বসে রকিং চেয়ারে দোল খেতে খেতে একটানে এই স্ট্যাটাসটি লিখে ফেলল।

জীবন এখন অনেক আনন্দময় তার। আল-হামদুলিল্লাহ! বাসায়-অফিসে-গাড়িতে এসির ভেতর সময় কাটে। গরম-ঠান্ডা যে-কোনো সময়েই ইচ্ছে করলে বরফের-কুঁচি-দেওয়া হিমশীতল পানি খেতে পারে সে। শুধু সেই পানিতে চুমুক দিলেই ১৮ বছর আগের এক তপ্ত দুপুরের জ্ঞান হারানোর নিদারুণ স্মৃতি মনে পড়ে যায় তার।...

আমার ফ্রেন্ডলিষ্ট-ফলোয়ারদের মাঝে অনেকের জীবনের ভয়ংকর কষ্টের কাহিনি জানি আমি। সেই কষ্টগুলো সবার সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়ার উপায়ও নেই কোনো। পৃথিবীর পথে পথে বারবার মুখোমুখি হন জীবন সংগ্রামের নানান রঙের তীব্র, একান্ত কষ্টগুলোর। মাঝে মাঝে অতি আপনজন ভেবে আমার সাথে শেয়ার করেন সেই কষ্টের অণু পরিমাণ অংশ। আমি সাহস কিংবা আশার কথা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না তাদের জন্য। আমার এই লেখাটি শুধু আপনাদের জন্য।

কষ্টের দিন পেছনে ফেলে এসে যেই আনন্দের দেখা আপনারা পাবেন—তার স্বাদ অসম্ভব মধুর। দয়া করে হাল ছেড়ে দেবেন না। কষ্টের এই সমুদ্র পেরিয়ে যাবেন আপনারা একটা সময়—ইন শা আল্লাহ।

অন্ধকার যত গভীর হয়, ভোর ততই কাছে চলে আসে।

“অতএব কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।”[১]

---

[১] সূরা আল-ইনশিরাহ, ৯৪ : ৫-৬

সুখের সংজ্ঞা

এক আত্মীয়কে নিয়ে ডাক্তারের কাছে এসেছি। ক্যান্সারের ডাক্তার। বিরাট পসার ডাক্তার সাহেবের, পানির মতো রোগী আসছে। যত রোগী আসছেন—সেই অনুপাতে রোগী বেরোতে দেখছি না। বেরোবার কি অন্য কোনো রাস্তা আছে? থাকতেও পারে, ডিজিটাল চেম্বার এগুলো, হয়তো একদিক দিয়ে রোগী ঢুকে-আরেকদিক দিয়ে বের হয়ে যান। একারণেই হয়তো এত মানুষের ভিড় চোখে লাগছে না।

ডাক্তারের চেম্বার সম্পর্কে আমার একটি ভীতি কাজ করে, আমার মনে হয় লক্ষ লক্ষ জীবাণু মুখ হা করে ঘোরাঘুরি করে ডাক্তারদের চেম্বারে। সুযোগ পেলেই ঢুকে পড়বে শরীরে। জ্বরের জন্য ডাক্তার দেখাতে গিয়ে বাসায় ফিরব বসন্ত রোগের জীবাণু শরীরে নিয়ে। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখব—জ্বর নেই, কিন্তু গা ভর্তি ছোটো ছোটো বসন্ত।

এই চেম্বারটি সে রকম না, বেশ পরিষ্কার, পরিপাটি করে সাজানো। কিন্তু আমার চেম্বার-জনিত-জীবাণুভীতি গেল না, চুপ করে এক কোনায় গিয়ে জবুথবু হয়ে বসে রইলাম। আত্মীয় ভদ্রলোক সামনের দিকে বসে আছেন, হাতে ট্রেনের টিকিটের মতো একটি কাগজ। ডিসপ্লে বোর্ডে নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে, টিকেট নাম্বার হিসেবে রোগী ভেতরে ঢুকছেন। পাশের সিটে একজন ভদ্রমহিলা বসা, পাশের তরুণী মেয়েটি সম্ভবত তার সাথে এসেছেন। চেম্বারে অতি সুন্দর একটি ওয়াল মাউন্ট টিভি লাগানো, সাউন্ড মিউট করা, অখ্যাত এক বিদেশী চ্যানেলে ছবি দেখাচ্ছে টিভিতে। অতি মনোযোগ দিয়ে বোবা ছবি দেখছে সবাই। ভদ্রমহিলার ডাকে সংবিৎ ফিরল,

- 'আপনি কি রোগী?' ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

- না আন্টি, আমি এক আত্মীয়কে নিয়ে এসেছি।

- 'ও আচ্ছা।' চুপ করে গেলেন তিনি।

নিতান্ত কিছু না বললে অভদ্রতা হয়ে যায়, সেই কারণে কথা চালিয়ে গেলাম আমি,

- আন্টি কি ডাক্তার দেখাতে এসেছেন?

- জি বাবা।

- কী সমস্যা আপনার আন্টি?

তাকে দেখেই খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

- হাড়ের ক্যান্সার বাবা, ৩ বার কেমো দেওয়া হয়ে গেছে। বেশি দিন আয়ু নেই আর, খুব তাড়াতাড়ি মরে যাব।

বুক ধ্বক করে উঠল আমার, এত নির্লিপ্ত গলায় নিজের মৃত্যুর কথা আগে কাউকে বলতে শুনিনি।

- কী যে বলেন আন্টি! আপনি অবশ্যই অনেকদিন বাঁচবেন ইন শা আল্লাহ।

কিছুটা অভয় দিতে কিংবা পেতে চাইলাম আমি।

- না বাবা। বাঁচব না। আমার স্বামীকেও আমি আপনার মতো করে বলতাম, তোমার কিছু হবে না, অনেকদিন তুমি আমাদের মাঝে থাকবে। থাকেনি। ফুসফুসের ক্যান্সার হয়েছিল তার। পাঁচ মাস আগে ধুপ করে এক সন্ধ্যায় চলে গেল আমাদের ফেলে।

আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ভদ্রমহিলার কথা, কী ভয়ংকর কথা! মাত্র পাঁচ মাস আগে স্বামী হারিয়েছেন, এখন নিজেও পরপারে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন! আমি মাথা নিচু করে চোখের পানি লুকাতে লুকাতে জিজ্ঞেস করলাম,

- আপনার ছেলেমেয়েরা আন্টি, তারা কোথায়?

- এই আমার এক মেয়ে, কোনো ছেলে নেই। আমি শিক্ষকতা করি, মা-মেয়ের সংসার। পাশে বসা তরুণীকে দেখিয়ে বললেন তিনি, তারপরের কথাগুলো বলতে গিয়ে গলা ধরে এল তার।

- আজকে এসেছি মেয়েকে দেখাতে। গত সপ্তাহে খুব পেট ব্যথা ছিল। ডাক্তার সাহেব একগাদা পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন। রিপোর্ট দেখিয়েছিলাম গতকাল। মেয়ের কোলন

ক্যান্সার ধরা পড়েছে!

তীব্র বিস্ময় নিয়ে জল-ভরা-চোখে ভদ্রমহিলার দিকে তাকালাম আমি। তিনি সাদা শাড়ির কোনা দিয়ে চোখের পানি মুছলেন। কোলন ক্যান্সারের রোগী, শান্ত চেহারার তরুণীটি শুধু একপলক ফিরে তাকাল আমার দিকে। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

আপাতত মৃত্যু পরোয়ানা চোখে নিয়ে ঘুরে-বেড়ানো মানুষদের চোখের দিকে তাকানোর মতো ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা দেননি আমাকে।

****

আমার নিজের যত জাগতিক দর্শন, তার কারিগর আমার 'মা'। প্রথম কৈশোরে বাবাকে হারানোর পর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মাঝে দিয়ে বড়ো হতে হয়েছ—আমার মা সম্ভবত তা অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন। বোধকরি সে কারণেই, বিভিন্ন ভাবে তিনি তাঁর চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, যুক্তি-উপাত্ত, আমার মাঝে বপন করে দিয়েছেন—কখনও শৈশবে, কৈশোরে কখনও, কখনও-বা যৌবনে। এই মূল্যবোধ নিয়েই এতটুকু পথ পাড়ি দিয়েছি। তার অনেকগুলো দর্শনের মাঝে একটা ছিল— "কখনও কারও সাথে নিজের তুলনা করবে না। আর নিতান্ত যদি করতেই হয়, তবে তোমার নিচের দিকে তাকিয়ে তুলনা করবে।"

সে কারণেই আধপেটা খেয়ে বাসের পেছনের বাম্পারে বাদুর-ঝোলা হয়ে কলেজে গিয়েছি খুশিমনে; যেই ছেলেটা খালি পেটে অতটা দূর হেঁটে কলেজে যেত তার থেকে আমি কত ভালো আছি—এই কথাটা ভেবে। আমি এখনও মনে-প্রাণে সেই দর্শনগুলো বুকে লালন করি।

এই শিক্ষিকা ভদ্রমহিলার কষ্টের সাতকাহন সে কারণেই আমাকে আবার সৃষ্টিকর্তার সামনে নতজানু করে দেয়, তাঁর সামনেই মাথা নত করতে শেখায়, অকৃপণভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে শেখায়।

কত সুখেই-না রেখেছেন আমাদের আল্লাহ তাআলা! আল-হামদুলিল্লাহ।

টুকরো টুকরো গল্প

১

বাসায় ফিরছিলাম।

বসুন্ধরার মেইন গেইটে যথারীতি জ্যাম। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে চেপে বসলাম রিকশায়। ভ্যাপসা গরম পড়েছে। খুব আইসক্রীম খেতে ইচ্ছে করল হঠাৎ। কিন্তু নেমে গিয়ে কিনে আনতেও ক্লান্তি লাগছিল। ঠিক এই সময়টায় বাচ্চাটির দিকে নজর পড়ল। আরহামের চেয়ে বছর খানেক বড়ো হবে। দেখতে অবিকল পুতুল। বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে। বাবা-মায়ের খাওয়া শেষ, ছেলের জন্য অপেক্ষা। কোথাও যাবেন বোধহয় তারা, মা তাড়াতাড়ি আইসক্রিম শেষ করার জন্য বলছেন ছেলেকে। শেষ করার একটু বাকি ছিল। মায়ের অনুরোধে সেইটুকুই ছুড়ে মারল ছেলেটি।

পাশে-দাঁড়ানো-বাবা আর রিকশার আরোহী আমি—একসাথে হেসে উঠলাম মায়াভরা ছেলেটির ঠোঁট উল্টানো দেখে। কিন্তু মুখের হাসি মুখেই ঝুলে থাকল আমাদের। রিকশার পেছন থেকে বিদ্যুতবেগে ছোটো একটি মেয়ে এসে আইসক্রিমের বাকি অংশ তুলে খাওয়া শুরু করল! সমবয়সী একটি মেয়েকে ফেলে-দেওয়া আইসক্রিম কুড়িয়ে খেতে দেখে পুতুলের মতো ছেলেটি খুব অবাক হয়েছে বলে মনে হলো। প্রবল বিস্ময় নিয়ে ছেলেটি রাস্তায়-দাঁড়ানো মেয়েটির আইসক্রিম খাওয়া দেখছে।

জীবনের কঠিন বাস্তবতার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ এভাবে, এখন দেখতে হবে—ভাবতেও পারিনি। ঘটনাটি এখানেই শেষ হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। আনন্দের বিষয়, শেষ হলো না ঘটনা।

ছোটো ছেলের পাশে-দাঁড়ানো হতভম্ব বাবা নিমেষে ছুটে গেলেন দোকানে। মিনিট তিনেক পরে ঠিক একইরকম একটি আইসক্রিম কিনে নিয়ে এসে নিজের ছেলের হাতে তুলে দিলেন। না, খেতে নয়। ফেলে-দেওয়া আইসক্রিমটি তখনও চেটে-পুটে খাওয়া রাস্তায়-দাঁড়ানো মেয়েটির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য! আমি অন্যদিকে মুখ ফেরালাম! অতি তুচ্ছ কারণে ইদানীং চোখ জ্বালা করে। পরমুহূর্তেই মন ভীষণ রকম ভালো হয়ে গেল। রিকশা ততক্ষণে একটু সামনে গেছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম পেছনে।

এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত মমতার জন্য প্রস্তুত ছিল না মেয়েটি। বাঁ-হাতে কুড়িয়ে-নেওয়া আইসক্রিমটি আর ডান-হাতে নতুন-পাওয়া আইসক্রিমটি ধরে বিস্ময় নিয়ে পরিবারটিকে চলে যেতে দেখছে সে!

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। হঠাৎ করে সবার সাথে আবার শেয়ার করতে ইচ্ছে হলো। আল্লাহ্ তাআলা সেই বাবা-মাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

২

সেলুনে গিয়েছিলাম চুল কাটাতে।

গেল মাসে যেবার শেষ চুল কাটাতে গিয়েছিলাম, ঠিক পাশের চেয়ারে একজন বয়স্ক মানুষকে গালভর্তি সফেদ দাড়ি (মোটামুটি দীর্ঘ) কেটে ক্লিন শেভড হয়ে বের হয়ে যেতে দেখেছিলাম। নিজে বের হবার আগে নিশ্চিত হয়েছিলাম—ভদ্রলোক মুসলিম। কোনো এক অজানা কারণে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। ভদ্রলোক দাড়ি রাখবেন, নাকি ক্লিন শেভড হবেন—পুরোপুরি তার বিষয়। (দাড়ির বিষয়ে দ্বীনের বিধান নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে নেই এখানে)। তবুও বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে ছিল ভদ্রলোকের 'পরিতৃপ্ত মুখে' চলে যাওয়া দেখে।

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আজকে একই রকম দৃশ্য আবার দেখলাম। এবারের অনুভূতি অবশ্য পুরোপুরি ভিন্ন।

আমি দোকানে থাকতেই মুখভর্তি বড়ো দাড়ি নিয়ে কম বয়স্ক এক ভাই দোকানে ঢুকেছিলেন। শেষের চেয়ারে বসায় তেমন খেয়াল করিনি। টাকা পরিশোধের সময়ে খেয়াল করলাম সেই ভাইয়ের দাড়ি মেশিন দিয়ে কেটে ফেলে দিচ্ছেন নাপিত। আর ভাইয়ের চোখে বইছে অশ্রুর বন্যা। রীতিমতো ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন সেই ভাই! শুধু আমি একা নই, মনে হচ্ছিল দাড়ির জন্য সেই ভাইয়ের তীব্র কষ্ট টের পাচ্ছিলেন দোকানের সবাই।

একবার মনে হলো, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি ছোটো সেই ভাইটির জন্য। তার দাড়ি কেটে ফেলার পেছনের গল্পের কথা জানি। পরমুহূর্তেই বাদ দিলাম সেই চিন্তা। ভাইটির মনের কষ্ট হয়তো আরও বেড়ে যেত তাতে।

মহান আল্লাহ ভালো জানেন, ঠিক কী কারণে ভাইটিকে এই কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। হয়তো ভার্সিটির অঘোষিত কোনো নিয়ম, হয়তো নতুন জয়েন করা অফিসের বড়ো কর্তার নির্দেশ, হয়তো বিয়ে ঠিক হয়ে থাকা পাত্রীপক্ষের অসহনীয় চাপ, হয়তো নিজের বাবা-মায়ের ক্রমাগত অনুরোধ। অনেক কারণই থাকতে পারে; আল্লাহু আ'লাম। তবে ভাইটির চোখের পানি নাড়া দিয়ে গেছে আমাকে নিশ্চয়ই। তার সেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা নিজের অতীতের কিছু ঘটনার স্মৃতি বয়ে নিয়ে এসে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞও করেছে আমাকে বৈকি।

মহান আল্লাহর কাছে অন্তর দিয়ে দুআ করছি, ভাইটির চোখের পানি যেন তার যাবতীয় গুনাহসমূহকে ধুয়ে-মুছে নিয়ে যায়। তার পরীক্ষা যেন সহজ করে দেন মহান আল্লাহ। খুব শীঘ্রই যেন তিনি আবার দাড়ি রাখতে পারেন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

একইসাথে দুআ করছি, মহান আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে এমন কোনো ভার না দেন যেটি বহন করার শক্তি আমাদের নেই। এমন কোনো পরীক্ষায় যেন তিনি আমাদের না ফেলেন, যেটি পার হওয়ার সামর্থ নেই তাঁর গুনাহগার এই বান্দাদের। আমীন।

৩

ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত আমি তোতলা ছিলাম। ক্লাস থ্রি থেকে শুরু আমার তোতলামি। যত বড়ো হচ্ছিলাম, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তোতলামি বেড়ে যাচ্ছিল।

পরিষ্কার মনে আছে, আমি একা একা চিন্তা করতাম—বাকি মানুষদের মতো আমারও জিহ্বা আছে। সুন্দর ও পরিপূর্ণ একটি জিহ্বা। তারপরেও আমি কথা বলতে পারতাম না। স্কুল-কলেজের সবাই কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া মনের আনন্দে যখন কথা বলত, আমি তখন এক কোনায় বসে নিজের কষ্টের কথা ভাবতাম। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোতলামির বিষয়টি খুব কষ্টকর ছিল আমার জন্য।

এখন ভাবি—এই-যে আমি এখন পরিপূর্ণভাবে কথা বলতে পারছি, এর জন্য কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আল্লাহ তাআলার কাছে? যে কষ্টটুকু আমার অহর্নিশি সাথি ছিল, আমার রবের অসীম করুণাতে সেই কষ্ট দূর হয়ে যাবার কারণে কতটা কৃতজ্ঞ আমি? যেই জিহ্বা পরিপূর্ণ থাকার পরেও অকার্যকর ও আড়ষ্ট ছিল, সেটি কার্যকর হবার পরে

সেই জিহ্বাকে নিজ রবের স্মরণে কতটুকু ব্যস্ত রেখেছি আমি? লা হাওলা ইল্লা বিল্লাহ!

আসলে সবকিছু পরিপূর্ণ থাকাটাকেই আমরা স্বাভাবিকভাবে নিই। আপনার হাত, পা, জিহ্বা, চোখ, মুখ, দাঁত—শরীরের সবকিছু দেখতে পরিপূর্ণ হলেও কিছুই ঠিকভাবে কাজ করত না, যদি আল্লাহ তাআলা না চাইতেন। এটিই সবচেয়ে বড়ো সত্য।

নিজ শরীরের বিষয়েই আমরা এত অসহায়!

তারপরেও মানুষ অকৃতজ্ঞ! আফসোস!

মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলার অসীম নিয়ামাতের বিপরীতে কোনো সন্তুষ্টিই তো প্রকাশ করতে পারছি না আমি!

পারছি কি?

৪

হকি স্টিক দিয়ে মারামারি করছে কিছু মানুষ, এমন একটি ছবি দেখে জনৈক ভাইকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'দেখেন ভাই! হকি স্টিক বানানো হয়েছে কী কাজে। আর ব্যবহার করা হচ্ছে কী কাজে! হকি স্টিক এর পুরো জব ডেসক্রিপশন (JD) চেঞ্জ!

জনৈক ভাই, 'ও ভাই, আপনাকে ও আমাকে কোন কাজের জন্য বানানো হয়েছে?'

> "আমি মানব ও জীন-জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[২]

একটু থেমে আবার বললেন, 'হকি স্টিক ভেঙে গেলে তো গেলই। কোনো জবাবদিহিতা নেই ওর। কিন্তু আমার ও আপনার কী হবে?'

> "তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?"[৩]

আল্লাহর শপথ! এতবার এতবার পড়েছি, মুখস্থ-ঠোঁটস্থ করা এই দুটি আয়াত কখনও এইভাবে ধারণ করার সৌভাগ্য হয়নি। অথচ সামান্য হকি স্টিকের উদাহরণ থেকে আপাদমস্তক কাঁপিয়ে দিয়ে গেলেন এই ভাই! সুবহানাল্লাহ!

---

[২] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ৫৬
[৩] সূরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১১৫

৫

আমার অফিসের ওয়েস্ট বিন (ময়লার ঝুড়ি) এতদিন ছিল আমার বাম দিকে। যখনি কোনো ময়লা, ছেঁড়া কাগজ ফেলতে হতো, বাম দিকে ঝুঁকে সেই ঝুড়িতে ফেলে দিতাম।

গত ৩ দিন আগে অফিসের পিওন কোনো এক কারণে ঝুড়িটি সরিয়ে ডান দিকে রেখেছে। অদ্ভুত বিষয়, প্রতিবার যখনই কোনো ময়লা, ছেঁড়া কাগজ ফেলতে নিই, ডান-দিকে-রাখা ঝুড়ির বদলে অটোমেটিক্যালি হাত চলে যাচ্ছে বাম দিকে, আগের ঝুড়ির জায়গা। অবচেতন মনের কাজ।

মাত্র ৪/৫ মাসের অভ্যাস। বেশ কয়েকবার মনে মনে স্থির করেছি—ময়লার ঝুড়িটি আমার ডান দিকে এখন, বামে না। তারপরেও ভুল করে বামে ফেলতে নিই আমি। অতি তুচ্ছ বিষয়। নিজের ওপরে নিজেই বিরক্ত হচ্ছিলাম। এই বিরক্তির মধ্যেই একটি কথা মাথায় এল।

মাত্র ৪/৫ মাসের অভ্যাসের কারণে অবচেতন মনে যদি পুরোনো অভ্যাসের দিকেই ফেরত যাই আমি, দীর্ঘ সময় মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকলে, নামায-রোযা-যিকির-শাহাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে, মৃত্যুর মতো ভয়ংকর সময়ে কীভাবে আমরা নিশ্চিত থাকি—মৃত্যুর আগে ঠিক ঠিক তাওবাহ করে শাহাদাত পড়ার পরম সৌভাগ্য আমাদের হবে?

আলেয়ার পিছে

১

জুনায়েদ সাহেব সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধনীদের মধ্যে একজন।

প্রচুর অর্থসম্পত্তি আর বিশাল প্রতিপত্তির অধিকারী জুনায়েদ সাহেবের মনে একটি মাত্র দুঃখ। তার একমাত্র মেয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। বয়স বিশের কোঠা পার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিচার-বুদ্ধি পাঁচ বছরের বাচ্চার মতো।

সেদিন বাসার সবাই বাইরে গেছে বিয়ের দাওয়াতে। প্রাসাদসম পুরো বাসায় তিনি আর তার মেয়ে। জুনায়েদ সাহেবের হঠাৎ চায়ের তেষ্টা পেল খুব। কী মনে করে মেয়েকে ডেকে এক কাপ চা বানিয়ে দেবার অনুরোধ করলেন তিনি। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মেয়ে আদৌ পারবে কি না—ঘোরতর সন্দেহে আছেন জুনায়েদ সাহেব। তারপরেও মেয়ে তার বাবার জন্য এক কাপ চা বানাতে পারে কি না, দেখতে চাইলেন তিনি।

দীর্ঘ এক ঘণ্টারও বেশি সময় পরে চা নিয়ে রুমে ঢুকল মেয়ে। চায়ে চুমুক দিয়ে জুনায়েদ সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। শেষ কবে এত চমৎকার চা খেয়েছেন, মনে করতে পারলেন না। বিস্ময় নিয়ে মেয়ের কাছে জানতে চাইলেন—কীভাবে এত চমৎকার চা বানাতে পারল সে! কিন্তু মেয়ের উত্তর শুনে রীতিমতো জ্ঞান হারানোর অবস্থা হল তার!

দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন ফ্লোরের ওপরে স্তূপ হয়ে আছে টাকার বান্ডিল। পাশেই দাউদাউ করে জ্বলছে তার কষ্টে অর্জিত টাকা!

তার বোকা মেয়ে চুলায় আগুন না জ্বালাতে পেরে প্রথমে আলমারি থেকে টাকার বান্ডিল

এনে জড়ো করেছে রান্না ঘরে। তারপরে স্তূপ-করা টাকায় আগুন ধরিয়ে সেই আগুনে বাবার জন্য চা বানিয়েছে। বেঁচে-যাওয়া টাকা রুমে এনে গুনতে বসলেন জুনায়েদ সাহেব। তার প্রতিবন্ধী মেয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা আগুনে পুড়িয়ে সামান্য এক কাপ চা বানিয়েছে বাবার জন্য।

রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে চোখে পানি এসে গেল তার। এত বোকা কেন তার মেয়েটি!

সত্যি, ভীষণ রকমের বোকা আমাদের জুনায়েদ সাহেবের মেয়েটি। সামান্য এক কাপ চা বানাতে গিয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মেয়েটি পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা আগুনে পোড়াল।

এবার তা হলে বলুন তো, এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য আমরা যারা পরকালের 'অমূল্য' এবং 'চিরস্থায়ী' জীবনকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলছি (প্রকারান্তরে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করছি), তারা কী?

আমরাও কি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নই? কে বেশি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী? জুনায়েদ সাহেবের প্রতিবন্ধী মেয়ে? নাকি আমরা?[৪]

২

পরীক্ষার রেজাল্টের দিনগুলোতে সকালে কেমন অনুভূতি হতো আপনার? রেজাল্ট কেমন হবে, সেই টেনশন কাজ করত কি?

আমার অবস্থা হতো বড়োই করুণ। মাথা ভোঁ-ভোঁ করে ঘুরত রীতিমতো। নিজের কানেই যেন শুনতে পেতাম বুকের ভেতরের টিপটিপ শব্দ। গলা শুকিয়ে কাঠ। রেজাল্ট খারাপ করলে কে কী বলবে—কত শত চিন্তা যে মাথায় ঘুরপাক খেত!

মেট্রিক, ইন্টার, বিএসসি, আইএসএসবি—সব পরীক্ষার রেজাল্টের দিন একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি। কী-যে অস্থিরতা কাজ করত! এই-যে লিখছি; তাতেই যেন দিব্যি টের পাচ্ছি দিনগুলোর ভীতিকর মুহূর্তগুলো!

হে আমার ভাই-বোনেরা,

একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন, কিয়ামাতের দিন যখন মহান আল্লাহর সামনে 'জীবনের প্রকৃত পরীক্ষার রেজাল্ট' নেবার জন্য আমরা দাঁড়াব—কেমন হবে সেই মুহূর্তের অনুভূতি?

[৪] বিদেশী গল্প অবলম্বনে

আল্লাহ্ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন,

> "কিয়ামাতের দিন তাদের সবাই তাঁর (মহান আল্লাহর) কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।"[৫]

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। মহান আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা ছাড়া আর কোনো আশ্রয় ও সাহায্য নেই।

কোথায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছি আমরা? কীসের আশায়?

এখনও?

---

[৫] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৫

নিয়ামাত

১

বনানী কাঁচা বাজারে গিয়েছি ডিম কিনতে।

দোকানদারকে দাম দিয়ে বাকি টাকার জন্য অপেক্ষা করছি। ঠিক সেই সময় দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন দরিদ্র এক মধ্যবয়স্ক মানুষ। কোলে ৩/৪ বছরের এক শিশু।

খানিক কাঁচুমাচু করে ২০ টাকার একটি জীর্ণ নোট দিলেন ডিম দোকানদারকে। দোকানদার বিরক্ত চেহারায় একটি পলিথিনের ভেতর কিছু জিনিস ঢুকিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিতেই দ্রুত হেঁটে চলে গেলেন মানুষটি।

ঠিক কী জিনিস পলিথিনে দিলেন দোকানদার, বুঝতে পারিনি আমি। আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করতেই মন তীব্র রকম খারাপ হয়ে গেল।

কাস্টমারকে ডিম দিতে গিয়ে প্রায় প্রতিদিনই হাত ফসকে পড়ে যায় কিছু ডিম। কিছু দোকানের সামনের ময়লা ফ্লোরে পড়ে। কিছু হয়তো দোকানের ভেতরের স্যাঁতসেতে চটের বস্তায়। এই ডিমগুলোই তাড়াহুড়ো করে সেই অপরিষ্কার জায়গা থেকে হাত দিয়ে তুলে পলিথিনে ভরে ফেলেন দোকানদার। কোনোটার কুসুম থাকে না, কোনোটার আবার সাদা অংশে ময়লা লেগে থাকে।

এক হাতে কোলের শিশুটিকে আর অন্য হাতে পলিথিনের প্যাকেটটি বুকের কাছে ধরে মানুষটির ওরকম করে দ্রুত চলে যাবার কারণটি কুড়িয়ে-কাঁচিয়ে নেওয়া, দোকানদারের

প্রায় অপচয়ের খাতায় চলে যাওয়া কিছু ময়লা-ভাঙা কালচে টাইপের ডিম!

২

প্রচণ্ড রোদের মধ্যে আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। মাসজিদে নববির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু। পথেই দেখা হয়ে গেল উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে। আবূ বকরকে জিজ্ঞেস করলেন উমার, এই গরমের মধ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে এলেন যে!

– কী করব? দুঃসহ ক্ষুধা তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে বাড়ি থেকে।

– হে আবূ বকর! আমি নিজেও যে একই কারণে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছি।

দুজনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ দেখলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে আসছেন তাঁদের দিকে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কথা তুললেন, কী ব্যাপার? এই অসময়ে কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

– হে আল্লাহর রাসূল! ক্ষুধার কষ্টই আমাদের বাড়ি থেকে বের করে এনেছে।

– সেই পবিত্র সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমিও যে একই কারণে বের হয়ে এসেছি ঘর থেকে। চলো সামনে এগিয়ে যাই।

তিনজন মিলে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলেন আবূ আইয়ূব আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে। আবূ আইয়ূব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্বভাব ছিল প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য খাবার তৈরি করে অপেক্ষা করা। তিনি না এলে বাড়ির সবার সাথে সেই খাবার ভাগাভাগি করে খেতেন আবূ আইয়ূব। সেদিনও অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের সময় না আসায় তিনি সবাইকে নিয়ে খাওয়া শেষ করে ফেলেছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই সঙ্গীকে নিয়ে এলেন। এই অবস্থায় আবূ আইয়ূব দ্রুত একটি বকরি জবাই করে ভুনা করার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর স্ত্রী রুটি বানিয়ে ফেললেন ইতিমধ্যে। মেহমানদের সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেতে নিয়ে থেমে গেলেন হঠাৎ। তারপর একটি রুটির ওপরে কিছু ভুনা মাংস রেখে সেটি আবূ আইয়ূবের হাতে দিয়ে বললেন, “একটু আমার মেয়ে ফাতিমার কাছে দিয়ে এসো এই খাবার। অনেক দিন হয় আমার মেয়ে এমন খাবার খায় না।”

আবূ আইয়ূব ফাতিমা রদিয়াল্লাহু আনহা-কে খাবার দিয়ে ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই প্রিয় সাথিকে নিয়ে খাবার খেলেন। খাবার শেষে খাবারের দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "রুটি, মাংস, খুরমা, পাকা ও আধ-পাকা খেজুর!"

এইটুকু বলতেই গলা ধরে এল তাঁর। দুচোখ ভর্তি পানি নিয়ে আবার বললেন, "মহিমান্বিত আল্লাহর শপথ! এই সবই হচ্ছে সেই নিয়ামাত, যার বিষয়ে কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা যখন কোনো নিয়ামাত গ্রহণ করার জন্য হাত বাড়াবে, তখন 'বিসমিল্লাহ' বলবে। তারপর তৃপ্তি নিয়ে খাবার শেষ করার পরে বলবে— الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا وأفضل।

> 'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের যিনি আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছেন এবং আমাদেরকে নিয়ামাত দান করেছেন যা অনেক উত্তম।'"[৬]

৩

আবদুল মজিদ মিয়া গত চার সপ্তাহ থেকে হাসপাতালে ভর্তি।

বয়স চুয়াত্তরে পড়েছে গত অক্টোবরে। সংগত কারণেই বেশ কিছু রোগও বাসা বেঁধেছে শরীরে। গলায় ছোটো একটি টিউমারের জন্য খেতে পারছিলেন না তিনি। ডান চোখে ছানি পড়েছে বেশ কয় বছর হয়। কিছুই দেখতেন না ডান চোখে। বাম চোখেই কাজ সারতেন তিনি।

গত সপ্তাহে একসাথে দুটি অপারেশন হয়েছে তার। গলার টিউমার কেটে ফেলে দিয়েছেন ডাক্তার। চোখের ছানিও অপারেশন করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আবদুল মজিদ মিয়া এখন মোটামুটি সুস্থ। বেশ আরাম করে খেতে পারছেন। ডান চোখেও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।

দুপুরে খেতে বসেছিলেন আবদুল মজিদ। ডাক্তার সাহেব যাবতীয় বিল সাথে নিয়ে এসেছেন তাকে দেখাতে। খেতে খেতেই বিলের ওপরে চোখ বুলালেন মজিদ সাহেব। হঠাৎ করেই কেন জানি কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

রোগীর হঠাৎ কান্নায় বিল-নিয়ে-আসা ডাক্তার সাহেব ঘাবড়ে গেলেন খুব। টাকার অঙ্ক মজিদ সাহেব সম্ভবত পরিশোধ করতে পারবেন না—ভাবলেন তিনি।

---

[৬] হায়াতুস সাহাবা, ১/৫১৫-৫৫১; সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, ১/১২৪-১৩০

ডুকরে-কাঁদতে-থাকা রোগীর পাশে চেয়ার টেনে বসলেন ডাক্তার সাহেব,

- মজিদ সাহেব! আপনি দয়া করে কাঁদবেন না। আমরা তো আছি। আমি বুঝতে পারছি, টাকার অঙ্ক আপনার জন্য একটু বেশিই হয়ে গেছে। আপনি একটি দরখাস্ত করুন। আমরা যতটুকু সম্ভব ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব।

- ডাক্তার সাহেব! এই বিলের টাকার অঙ্ক পরিশোধের ভয়ে কাঁদছি না। বিচিত্র একটি চিন্তা মাথায় এসেছে। সেই কারণেই কান্না চাপতে পারছি না ভাই।

- তবে কেন এইভাবে শিশুর মতো কাঁদছেন আপনি?

আবদুল মজিদ মিয়া কাঁদতে কাঁদতেই উত্তর দিলেন, "গত ৭৪ বছর ধরে মহান আল্লাহ পাক কোনো কষ্ট ছাড়াই খেতে দিয়েছেন আমাকে, চোখেও পরিষ্কার দেখতে দিয়েছেন। কিন্তু একবারের জন্যও তিনি কোনো বিল পাঠাননি আমাকে! এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার চিন্তা যে মাথায়ও আসেনি আমার।"

পিন-পতন-নিস্তব্ধতা পুরো কেবিনে। উপস্থিত সবাই হঠাৎ যেন অন্য কোনো জগতে চলে গেছেন। একটিমাত্র কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শুধু—'এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার চিন্তা যে মাথায়ও আসেনি আমার!'

> "যে-সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নিয়ামাত গণনা করা শুরু করো, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।"[৭] [৮]

---

[৭] সূরা ইবরাহীম, ১৯ : ৩৪

[৮] বিদেশী গল্প অবলম্বনে

ঠকাচ্ছি কাকে?

১

বড়ো দুঃসময় পার করছি আমরা। আমি, আপনি এবং সে—আমরা সবাই।

আমরা জুমুআর সালাত ছাড়া মাসজিদে যাই না।

রমাদানের ৩০টি সাওমের সবগুলো রাখা হয়ে ওঠে না আমাদের।

আমরা যাকাতের বিষয়ে উদাসীন। যাকাত আদায় করলেও হিসেব করে সঠিক পরিমাণ যাকাত দিই না।

পৃথিবীর অর্ধেক দেশ ঘুরে ফেললেও মক্কাতে গিয়ে হাজ্জ করার মতো টাকা-পয়সা ম্যানেজ করতে পারি না আমরা।

আমরা হিজাব করতে অস্বস্তি বোধ করি। কোনোভাবে শরীরের হিজাব পালন করলেও মনের হিজাবের কথা বেমালুম ভুলে আছি।

সুদ-কে 'ইন্টারেস্ট' হিসেবে বিবেচনা করতে আনন্দ হয় আমাদের। প্রতিনিয়ত আমরা খুঁজে বেড়াই 'সুদ এবং ইন্টারেস্ট-এর পার্থক্য' এবং ইন্টারেস্ট গ্রহণের যৌক্তিকতা।

ইসলাম-শিক্ষা আমাদের কাছে চতুর্থ বিষয় বা ফোর্থ সাবজেক্ট। ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান পড়ার পরে সময় থাকলে পড়া যাবে। পাশ করলে কিছু নাম্বার যোগ হবে, ফেল করলে ক্ষতি নেই।

এক মাস পরের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা/বি.সি.এস পরীক্ষা/পদোন্নতির পরীক্ষা নিয়ে আমরা দারুণ ব্যস্ত। অথচ এক 'সেকেন্ড' পরেই যে মৃত্যুর পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে—ভুলে থাকি আমরা।

নজরুল-রবীন্দ্রনাথ-গোর্কি গুলে খেয়ে ফেলেছি। আলমারির-ওপরে-রাখা পবিত্র কুরআনের ওপরে দুই ইঞ্চি ধুলোর প্রলেপ।

চে গুয়েভারা, মাষ্টারদা আমাদের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে ৪ জন খলীফা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ১০ জন সাহাবিদের নাম বলতে পারব না আমরা, জীবন-কাহিনি তো অনেক দূরের কথা।

আমাদের যে-কোনো আড্ডা-আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে থাকে পরনিন্দা।

দিনান্ত পরিশ্রম করি ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্য। আখিরাতের ঘরের ব্যাপারে উদাসীন সবাই।

গাড়ি-বাড়ি-শাড়ি-গহনা নিয়ে আমরা অন্য পরিবারের সাথে আমৃত্যু প্রতিযোগিতা করি। উত্তম বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা আমাদের স্বভাবে নেই।

বেতন-পদোন্নতির জন্য মামা-চাচা-খালুর পায়ে ধরতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমরা। মহিমান্বিত আল্লাহর জন্য দুই পায়ে কিবলার দিকে দাঁড়ানোর শক্তি পাই না।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক উৎকর্ষতার জন্য হেন চেষ্টা নেই যা করছি না, শুধু পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ ছাড়া।

এ রকম আরও হাজার হাজার উদাহরণ দিতে পারব, কিন্তু আমল করার বিষয়ে বড়ো বেখেয়াল আমরা।

ধিক! আফসোস!!

২

ফজরে উঠতে পারিনি আজকে, বাকি ৪ ওয়াক্ত পড়ে আর কী হবে? এরচেয়ে কালকে ফজর থেকে নতুন করে শুরু করব।

এই-যে সুদ-ঘুষ খাই, এগুলো খারাপ জানি। একেবারে হাজ্জ করে এসে সব ছেড়ে দেব।

শালীনভাবে চলা আমাদের দরকার—এটা মানি। কিন্তু এখন বিভিন্ন কারণে পারি না। যখন পর্দা ধরব, তখন একেবারে বোরকা-হিজাব-নিকাব করব।

একটু-আধটু প্রেম-ভালোবাসা খারাপ না। বিয়ের পরে স্ত্রীর প্রতি সৎ থাকলেই তো হলো।

হিজাব তো করি। দু-একটা প্রোগ্রামে শুধু হিজাব করি না। ক্লোজ বন্ধু-আত্মীয়দের বিয়ে

তো, তাই।

মুখের ওপরে মামাতো বোন, ফুফাতো বোন, খালাতো বোনদের গায়েরে মাহরাম কীভাবে বলি? এতদিন একসাথে বড়ো হয়েছি। পিঠাপিঠি বয়স। আমি তো আসলে বোনের মতো দেখি ওদের।

জন্মের পর থেকেই মামি-চাচিদের কাছে মানুষ। উনারা আমার মায়ের মতো। উনাদের সাথে দেখা না দিলে মানুষ কী বলবে?

বিয়ে তো জীবনে একবারই করতেছি। একটু মজা করে (হারাম বিষয়াদি-সহ) না করলে কি হয়?

লিস্ট লম্বা করতে চাইলে সাচ্ছন্দে করা যাবে।

আল্লাহ তাআলা শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং নাফসের তৈরি নিজস্ব যুক্তি থেকে হিফাজত করুন।

> "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।"[৯]

> "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? যারা এমন করে, পার্থিব জীবনে দূর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনোই পথ নেই। কিয়ামাতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে গাফিল নন।"[১০]

৩

অতঃপর...

পুরো রমাদান যাবৎ শেইভ না করার কারণে গজিয়ে-ওঠা হালকা দাড়ি ঈদের দিন সকালে কেটে-ছেঁটে 'ক্লিন শেইভড' হয়ে ঈদগাহে যাওয়া কিংবা পুরো রমাদান বন্ধ থাকা বাসার টিভি ঈদের আগের রাতে সচল করা এবং ৭ দিনব্যাপী ঈদের লাগাতার প্রোগ্রামের সাথে সুপার গ্লু-এর মতো লেপ্টে থাকা...

অথবা...

রমাদান জুড়ে পরচর্চা-গীবত পরিহার করে চলার পর ঈদ-পরবর্তী পুনর্মিলনীতে 'অমুক ভাবির ঈদের ড্রেস কীরকম ক্ষ্যাত', 'অমুক ভাবির মেয়ে তমুক ভাইয়ের ছেলের সাথে'-

[৯] সূরা আ ল ইমরান, ০৩ : ১৯
[১০] সূরা আল-বাকারা, ০২ : ৮৫

জাতীয় আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে যাওয়া...

নতুবা...

রমাদান জুড়ে খুঁজে-খুঁজে ভিক্ষুক, মিসকীনদের টাকা-পয়সা দেওয়ার পরে ঈদের দিন বিকেলে নিজের দরজায় কড়া নাড়া ভিক্ষুকের মুখের ওপর 'মাফ করো' বলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া এবং বাসার সিকিউরিটি গার্ডের সাথে 'কীভাবে এরা গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকে?' বলে চিৎকার করা...

অথচ রমাদানের সিয়াম (রোযা) আমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছিল যাতে আমরা আল্লাহ-ভীতি বা তাকওয়া অর্জন করতে পারি।

'আল্লাহ-ভীতি' বা 'তাকওয়া' অর্জিত হলো কি আমাদের?

৪

একতরফা ভালোবাসা

আমাদের সময়ে 'ইসলাম শিক্ষা' নামের একটি সাবজেক্ট ছিল এস.এস.সি-তে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনীর কিছু অংশ ছিল সেই সিলেবাসে। সাধারণ বিজ্ঞান, ইংরেজি কিংবা উচ্চতর গণিতের তুলনায় ইসলাম শিক্ষা সাবজেক্ট আমরা বিশেষ গুরুত্বের সাথে পড়তাম না। কোনোভাবে পাশ করাই ছিল মুখ্য। সে কারণেই বাকি বিষয়গুলোতে প্রাইভেট টিউটরের কাছে দৌড়ালেও ইসলাম শিক্ষার জন্য 'পপি গাইড'-ই যথেষ্ট মনে করতাম। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়িয়ে লাখ টাকা ইনকাম করতেন। ইসলাম শিক্ষার শিক্ষকদের কাছে কেউ প্রাইভেট পড়ত বা পড়েছে বলে শুনিনি কখনও।

সেই ইসলাম শিক্ষার প্রভাব এস.এস.সি পরীক্ষার সাথেই শেষ হয়ে যেত। এইচ.এস.সি থেকে ওপরের দিকের পড়ালেখায় ইংরেজি, বিজ্ঞান আর গণিতের বিষয় থাকলেও ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আর পাওয়া যেত না সিলেবাসে।

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে ইসলাম শিক্ষার মতো বিষয় কোনো পর্যায় পর্যন্ত আছে—জানা নেই আমার। তবে অনুমান করতে পারি, আমাদের সময়ের থেকে উন্নত হয়নি অবস্থা। যেহেতু পাঠ্যপুস্তকে ইসলাম নিয়ে ভালোভাবে জানার সুযোগ অতি সীমিত, জন্মসূত্রে মুসলিম প্রজন্মদের ইসলামের জ্ঞান প্রদানের দায়িত্ব কে নিবেন তা হলে? বাবা-মা'দের/ভাই-বোনদের কি দায়িত্ব নেই কোনো?

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই ভালোবাসা প্রস্ফুটিত হওয়ার একটি অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম তাঁর জীবনী পড়া, তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় জানা।

আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।"[১১]

একুশে বইমেলা চলছে ১ তারিখ থেকে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ বই কিনতে যাচ্ছেন সেখানে। বিভিন্ন বিষয়ের, বিভিন্ন লেখকদের বই কিনছেন। বই উপহার দিচ্ছেন স্ত্রীকে, সন্তানকে, পরিচিতদের। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা অন্যান্য রাসূলদের অথবা সাহাবিদের জীবনী-সংক্রান্ত কোনো বই কি কিনেছেন নিজের বা পরিবারের জন্য?

হুমায়ূন আহমেদ-এর রচিত চরিত্র 'হিমু' কিংবা 'মিসির আলি' আমাদের ভারি পছন্দ। এই ভালোবাসা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়নি। হুমায়ূন আহমেদের বই পড়েই তৈরি হয়েছে। হিমু কিংবা মিসির আলি সমগ্র রিভিশন দিই আমরা। অনেকে হিমু বা মিসির আলিকে অনুকরণ করতেও চেয়েছিলাম একসময়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা তাঁর সাহাবি রদিয়াল্লাহু আনহুম-দের অনুকরণ করতে চেয়েছি কয়জন?

বার্সেলোনা কিংবা রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল দলের সবচেয়ে প্রিয় তারকার নাড়ীর খবর আমরা জানি। পুরো দলের সব খেলোয়াড়দের নাম মুখস্থ আমাদের। কোনো খেলোয়াড় কোনো দেশের সেই খবরও বিলক্ষণ জানা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সন্তানদের সবার নামও জানা নেই আমাদের।

প্রিয় গায়ক-গায়িকার সব অ্যালবামের নাম, প্রকাশের বছর, হিট নাম্বারগুলোর লিরিকস, আগামী অ্যালবাম কবে বাজারে আসছে—সব তথ্য ঠোঁটের মুখে। প্রিয় নায়ক-নায়িকার বিখ্যাত ছবিগুলোর চরিত্রের নামও হৃদয়ে-গাঁথা। অথচ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামকরা সাহাবিদের নাম জানা দূরের কথা, পৃথিবীতে বসে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া সেই ১০জন সাহাবির নাম জানা আছে কয়জনের?

---

[১১] বুখারি, ১৩

এরপরেও আমরা চাই—কিয়ামাতের দিন তাঁর উম্মাত হিসেবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শাফাআতের মাধ্যম হবেন।

কীভাবে? এই রকম একতরফা ভালোবাসায়?!

৫

এক টুকরো বাগান আছে আমার।

নানা জাতের ফুলের গাছ আছে তাতে। আর আছে গুটি কয়েক আগাছা-জাতীয় বিষবৃক্ষ। বড়ো যন্ত্রণার ভেতর আছি এই বিষবৃক্ষগুলো নিয়ে। প্রতি সপ্তাহে সময় নিয়ে বিষবৃক্ষের ডালপালা কাটি। অতি চমৎকার ফুলগাছগুলো কুৎসিত বিষবৃক্ষের স্পর্শ যেন কোনোভাবেই না পায়—সেটার জন্য খুব চেষ্টা করি। বাগানে যত্ন করে পানি দিই, সার দিই। বড়ো সাধের ফুলগাছগুলো আমার।

পরের সপ্তাহে বাগানে গিয়ে দেখি বিষবৃক্ষের ডালপালা আবার বেড়ে উঠেছে। কিন্তু সাধের ফুল গাছগুলোর অবস্থা নিতান্তই করুণ! আবার সময় নিয়ে বিষবৃক্ষের ডালপালা কাটি, বাগানে সার-পানি দিই, ফুল গাছগুলোর যত্ন নিই।

পরের সপ্তাহে আবারও একই চিত্র! ফুল গাছগুলোর অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হয়েছে। বিষবৃক্ষের সতেজ ডাল গজিয়েছে! কী ভয়ংকর! আমি তো বিষবৃক্ষের কোনো যত্ন নিই না। সার-পানি তো সব বাগানের ফুলের গাছগুলোতে দিই। তবুও ফুলগাছগুলোর কোনো উন্নতি দেখি না!

আমি হতাশ হই না। আমার ধৈর্য রবার্ট ব্রুস সাহেবের থেকেও বেশি। আবার সময় নিয়ে বিষবৃক্ষের ডালপালা কাটি, বাগানে সার-পানি দিই, ফুল গাছগুলোর যত্ন নিই।

আমি দিব্যি জানি, যত নষ্টের গোড়া ওই বিষবৃক্ষ। তাই তো আমি নিয়ম করে বিষবৃক্ষের ডালপালা কেটে একদম ছোটো করে দিই। শুধু বিষবৃক্ষের মূল-সহ তুলে ফেলতে ইচ্ছে করে না আমার।

মায়া লাগে বোধহয়, ঠিক জানি না।

০৭

এসো তবে ফিরে

১

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলি'র ক্যাম্পাস।

মাত্র ক্লাস শেষ করে বাড়ি ফেরার জন্য বের হয়েছে আফ্রিকান-আমেরিকান ছেলেটি। ছেলেটির নাম দিলাম—আবরাহাম।

আবরাহাম পারিবারিকভাবে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী হলেও ধর্মকর্মতে তেমন মনোযোগ কখনোই ছিল না তার। তবে 'ইসলাম' নামের একটি ধর্ম রয়েছে—এই তথ্য জানা ছিল তার। পাড়ায় একটি মাসজিদও খেয়াল করেছে। কিন্তু নিজের ধর্মের মতো ইসলামের বিষয়েও আগ্রহ ছিল না তার।

ক্যাম্পাস থেকে বের হওয়ার সময়ে একটি ছেলের কাজ দৃষ্টি কাড়ল আবরাহামের। ব্যাগ থেকে বের করে আগ্রহী ছেলে-মেয়েদের একটি করে বই বিতরণ করছে ছেলেটি। ইউনিভার্সিটির মুসলিম ইয়ুথ সংগঠনের একজন সদস্য সে। আবরাহাম জানে না, পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ বিতরণ করছে সেই ছেলে।

আবরাহাম নিজের মতো করে পথ কাটাতে চাইলেও সেই ছেলেটি হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর একটি কপি বাড়িয়ে দিল আবরাহামের দিকে। মুচকি হেসে কপিটি নিয়ে ব্যাগে চালান করে দিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল আবরাহাম।

ক্যাম্পাস থেকে বাসে করে বাসায় যায় আবরাহাম। লম্বা দূরত্ব। চুপ করে চারপাশের নিত্যচেনা দৃশ্য দেখতে দেখতেই হঠাৎ ব্যাগের-ভেতর-রাখা বইটির (পবিত্র কুরআন)

কথা মনে হলো তার। বাসায় যেতে যেতে এই ফাঁকে একটু পড়ে নেওয়া যাক—ভাবল আবরাহাম।

বইটি কোলে নিয়ে দেখল সে। বইয়ের নাম 'আল-কুরআন'। আবরাহামের জানা নেই, এই বইটিই বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সবচেয়ে প্রামাণ্য দলিল। অন্য দশটা সাধারণ বইয়ের মতোই পৃষ্ঠা উল্টাল সে। সূরা ফাতিহা (The Opening)-কে সে ভাবল বইয়ের 'ভূমিকা'। নতুন বইয়ের ভূমিকা কেই-বা পড়তে চায়! দ্রুত পাতা উল্টাল আবরাহাম।

প্রথম অধ্যায়ের (মূলত দ্বিতীয়) নাম লেখা আছে 'আল-বাকারাহ্' (The Cow)। আবরাহাম পড়া শুরু করল,

১. আলিফ লাম মীম।
২. এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটি হিদায়াত সেই মুত্তাকিদের জন্য—

দ্বিতীয় লাইনেই (আয়াতে) আটকে গেল আবরাহাম।

বলে কী এই বইয়ের লেখক!

পাঠ্যবই থেকে শুরু করে গল্প, উপন্যাস—এই জীবনে অসংখ্য বই পড়েছে আবরাহাম। সারাজীবন দেখে এসেছে, যে-কোনো বইয়ের প্রথমে লেখক বইজুড়ে-ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা বিভিন্ন অনিচ্ছাকৃত ভুল তথ্য বা বানানের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং পরবর্তী সংস্করণে সেই ভুল শুধরে নেওয়ার আশ্বাস দেন। আর এই বইয়ের লেখক বইয়ের শুরুতেই নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিচ্ছেন—"এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই", কীভাবে সম্ভব!

কে এই বইয়ের লেখক?

আবরাহাম বইয়ের সামনের কাভারে লেখকের নাম খুঁজল। পেছনের কাভারও দেখল। আঁতিপাতি করে খুঁজেও কোথাও লেখকের নাম পাওয়া গেল না। তার অবাক হবার পালা শুরু। একটি বই যার শুরু হয়েছে বইয়ের তথ্যের ব্যাপারে লেখকের স্থির-বিশ্বাসের কথা দিয়ে (এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই)। আবার বইয়ের শুরুতে বা শেষে লেখকের নামও উল্লেখ করা হয়নি।

কী অদ্ভুত!

স্তব্ধ আবরাহাম কিছুক্ষণ চুপ করে বসে আবার মন দিল বইয়ে। একটা করে পাতা উল্টাচ্ছে সে, আর ধীরে ধীরে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়ে চলল আবরাহাম! এবং একটি সময় পরে ঠিক বুঝতে পারল সে—এই বইয়ের বাণী কোনো

মানুষের হতে পারে না।

ঘোর অন্ধকার থেকে সেই ছেলেটির আলোর পথে হাঁটার শুরু সেই বিকেল থেকেই, সেই বাসে বসেই; আল-হামদুলিল্লাহ!

পরবতীকালে এই ভাই ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে দ্বীনের দাওয়ার কাজে সংযুক্ত করেন। স্থানীয় একটি মাসজিদে ইমামতি শুরু করেন একসময়। তার মাধ্যমে অনেক ভাই-বোন ইসলামের আলোতে আলোকিত করেছেন নিজেদেরকে। ইন শা আল্লাহ, হিদায়াতপ্রাপ্ত এই সকল ভাই-বোনদের প্রতিটি সাজদা, প্রতিটি রুকূ, প্রতিবারের কৃতজ্ঞতার একটি অংশ পাচ্ছেন ইয়ুথ সংগঠনের সেই ছেলেটি। সুবহানাল্লাহ!

****

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ করুন!

ইউনিভার্সিটির মুসলিম ইয়ুথ সংগঠনের সেই ছেলেটি কি তার অলীক কল্পনায়ও ভেবেছিল—নিজ থেকে ডেকে সেই ছেলেটির হাতে যখন পবিত্র কুরআনের একটি অনুবাদ ধরিয়ে দিয়েছিল সেই মুহূর্তেই অসীম পুণ্যের একটি কাজের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে সে? হয়তো সংগঠনের নৈমিত্তিক দায়িত্ব হিসেবেই কুরআন বিলি করছিল সে। মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা তার হাত ধরেই আবরাহামের আলোর পথে চলার শুরু করিয়ে দিলেন।

আমাদের সবার জীবনেও এই রকম তুচ্ছ বিন্দুসম ঘটনা ঘটতে পারে, যেই বিন্দু মহান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় রূপ নিতে পারে পুণ্যের বিশাল সমুদ্রে।

কৃষক যখন তার জমিতে ফসলের বীজ ছিটায়, তখন সে নিশ্চিত করে জানে না কোন বীজটির অঙ্কুরোদগম হবে আর কোন বীজটি মরে যাবে অঙ্কুরেই। ফসলের কথা তো জানেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আমাদের দায়িত্ব হলো নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে বীজগুলো ছড়িয়ে দেওয়া!

মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার দাওয়াহকে (সেই দাওয়াহ যে-কোনো উপায়ে, মাধ্যমেই হোক না কেন) কবুল করুন।

২

গরুর গোশত রান্না করেছিলাম শখ করে।

রান্না শেষ করে একটা বাটিতে কিছু গোশত নিয়ে নক করলাম পাশের ফ্ল্যাটের দরজায়। বেশ কয়েকবার নক করার পর একজন বৃদ্ধা ফরাসি ভদ্রমহিলা বের হয়ে এলেন। দবয়স ৭০ এর মতো হবে। এখানে আসার পর হাতে গোনা দু-তিনবার মাত্র দেখা হয়েছে তার সাথে।

মৃদু হেসে তাকে বললাম আমি – 'এই গোশতের বাটিটা তোমার জন্য।'

ফরাসি ভদ্রমহিলা বেশ অবাক হলেন আমার কথায়। বিস্ময় কাটিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলেন তারপরেই,

– তোমার বাসায় নিশ্চয়ই আজ পার্টি আছে?

– না। আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা এটি।

– ঠিক কী রকম এই শিক্ষা? একটু বুঝিয়ে বলবে প্লিজ?

আমি খুব সংক্ষেপে বোঝাতে চেষ্টা করলাম,

– তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে গেছেন আমাদের, 'যখন তুমি তরকারি রান্না করবে, তখন পানি একটু বাড়িয়ে দিবে। তারপর তোমার প্রতিবেশীদের খোঁজ নিবে। তাদেরকেও কিছু দেবে।'[১২]

– ইসলামের মুহাম্মাদ এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন?

– জি। সেই শিক্ষার ফলেই সামান্য এই গোশত নিয়ে তোমার দরজার সামনে তোমার প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে।

– আমার মেয়ে এই বিল্ডিংয়ের ৫ তলায় থাকে। প্রতিদিন আমার দরজার সামনে দিয়েই যাওয়া-আসা করে। কিন্তু কোনোদিন 'মা, কেমন আছ তুমি?', এই সামান্য কথাটুকু বলার আগ্রহও পায় না সে। অথচ ইসলামের মুহাম্মাদ তোমাদের এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন! শোনো ছেলে, খুবই অবাক করে দিলে আমাকে তুমি!

একটু থেমে মুখ তুলে চাইলেন তিনি আমার দিকে –

'ঠিক আছে ছেলে। তুমি গোশতের বাটিটা নিয়ে যাও। তবে যাবার আগে মুহাম্মাদের ইসলাম আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাও।'

ফরাসি ভদ্রমহিলা মনে হলো চোখের পানি আড়াল করতে চাইলেন।

নাকি ভুল দেখলাম আমি!

---

[১২] মুসলিম, ২৬২৫

৭০ বছর বয়স্কা ফরাসি ভদ্রমহিলার আলোর পথে হাঁটার শুরু ঠিক সেদিন থেকেই![১৩]

৩

২০০৬ সালের এক সন্ধ্যায় বাসায় বসে ইউটিউবে কিছু ভিডিও দেখছিলাম।

হঠাৎ করেই একটা ভিডিওতে চোখ পড়ল। নামাজের ভিডিও। কুয়েতের গ্র্যান্ড মাসজিদের ইমাম শেখ মিশারি রাশিদ আফাসি রোজার সময় কিয়ামুল লাইল (রাতের নামাজ) পড়াচ্ছিলেন। আফাসির তিলাওয়াতের গলা অতি মধুর। আমি ভিডিওটি ডাউনলোড করে আগ্রহ নিয়ে দেখতে বসলাম।

ধীর-স্থিরভাবে নামাজ পড়াচ্ছেন ইমাম। হঠাৎ বিস্ময়ের সাথে দেখলাম, নামাজের মাঝামাঝি এসে তিনি কান্না শুরু করলেন! একপর্যায়ে কান্নার তীব্রতা এতই বেড়ে গেল, নামাজ পড়ানোই দায় তাঁর জন্য! ইমাম একাই শুধু কাঁদছেন, তা নয়; সাথে কাঁদছেন মুসুল্লিরাও। আমি আরবির কিছুই বুঝি না তখন। তারপরও অকারণে চোখে পানি এল। সাথে সাথে মাথায় বিদ্যুতের মতো একটি চিন্তাও এসে ভর করল—'ইমাম সাহেব পবিত্র কুরআন শরীফের কোন অংশ পড়াচ্ছিলেন? কী লেখা আছে সেখানে যার জন্য মাসজিদের প্রায় প্রতিটি মানুষ ঢুকরে কেঁদে উঠছিলেন?'

আবার বসলাম ইন্টারনেটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজি সাব-টাইটেল-সহ একই ভিডিও খুঁজে ডাউনলোড করে দেখতে বসলাম।

শপথ মহিমান্বিত সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার পুরো শরীর অবশ হয়ে আসছিল। পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা ফুসসিলাত (সূরা হা-মীম সাজদা নামেও পরিচিত)-এর একটি অংশ (আয়াত নং ১৯-৩৬) পড়ছিলেন তিনি। একজন সচেতন মুসলিম মাত্রই এই অংশটুকু মন দিয়ে পড়লে কিংবা শুনলে ভয়ে কাঁদতে বাধ্য। ঠিক সেই রাতের সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো—আফসোস! আমি কেন এতদিন আল-কুরআন বুঝে পড়িনি। সেই রাতেই শুরু করলাম পবিত্র কুরআন বাংলা অর্থ-সহ বুঝে পড়া।

আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সেই ভিডিওটি আপ করলাম ফেইসবুকে। নিচের লিংকে ক্লিক করে দেখতে পাবেন ভিডিওটি। সাথে বাংলা সাব-টাইটেল যোগ করে দিয়েছেন এক ভাই।

https://wwwfacebook.com/JavedKaisar/videos/ 10151706154649640

[১৩] শাইখ জিহান-এর লেকচার থেকে সংগৃহীত ও অনুলিখিত।

সবার কাছে বিনীত অনুরোধ আমার, নিবিষ্ট-মনে একটি বারের জন্য ৭ মিনিট ২২ সেকেন্ডের এই ভিডিওটি শুনুন এবং দেখুন। অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন। পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এর অর্থ জানার ইচ্ছে আপনার হবেই, ইন শা আল্লাহ!

****

কয়েক মাস আগে শাইখ মিশারি রাশিদ আফাসি হাফিযাহুল্লাহ-এর তিলাওয়াতের একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলাম টাইমলাইনে। সূরা ফুসসিলাত এর কিছু অংশের তিলাওয়াত। এর আগেও বেশ অনেকবার শেয়ার করেছিলাম একই ভিডিও। আমার নিজের দ্বীনের পথে আসার চেষ্টা করার অন্যতম মাধ্যম ছিল সেই ভিডিও।

গতকাল লন্ডন প্রবাসী এক ভাই ইনবক্স করলেন। সালাম বিনিময়ের পরে নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। ইংরেজি কথোপকথনটির মূল বিষয় বাংলায় লিখলাম।

"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভাই। আমি বাংলাদেশ থেকে লন্ডন আসি অনেকদিন আগে, ১৯৯৮ এর দিকে। আমি একজন ব্রিটিশ নাগরিক, যদিও পরিবারের অধিকাংশ সদস্য দেশেই থাকেন। শেষ দেশে গিয়েছিলাম ২০০৬ সালের মাঝামাঝি।

বিদেশে টিনেজার এই আমি কখন যে নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম, জানি না। ক্রমাগত উশৃঙ্খলতার মাঝে হারিয়ে ফেললাম নিজেকে। মারামারি করে ব্রিটিশ পুলিশের কাছে ধরা পড়লামও কয়েকবার। আরও নানাভাবে আইন ভেঙেছি। সরকার থেকে সতর্ক করা হয়েছে আমাকে। তারপরেও সংশোধিত হতে পারিনি। একপর্যায়ে অন্য শহরে পাঠানো হয় আমাকে। ব্রিটিশ পুলিশ পূর্ব লন্ডনের কিছু অংশে আমার যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। ওই এলাকাগুলোতে আমি ৩ বার প্রতিপক্ষের দ্বারা ছুরিকাহত হয়েছিলাম। একপর্যায়ে আমার পাসপোর্ট জমা নিয়ে নেয় সরকার। প্রায় একঘরে হয়ে পড়লাম। যতদিনে বুঝতে পেরেছি নিজের ভুল, বড্ড দেরি হয়ে গেল। ঠিক তারপরেই একের পর এক দুর্যোগ নেমে এল আমার জীবনে।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদু মারা গেলেন ২০১১ সালে। আমি দেশে যেতে চাইলাম। কোর্ট পাসপোর্ট দিল না। ২০১৩ সালে মারা গেলেন আপন বড়ো ভাই। এবারও যেতে পারলাম না দেশে পাসপোর্টের কারণে। সেই সময়টাতে নিজের অসহায়ত্বের কথা আপনাকে বোঝাতে পারব না আমি। প্রায় একই সময়ে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল দীর্ঘদিনের পছন্দের মানুষটির সাথে। তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে আমার বদলে সেই পছন্দের মানুষটি বিয়ে করে ফেলল আমারই ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে। আমি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ-হারা হয়ে গেলাম।

২০১৫ সালের মার্চ মাসে মারা গেলেন আমার মা। আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। পাসপোর্ট পাবার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটলাম একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে। ৩ জন ব্রিটিশ এমপি আমার পক্ষ হয়ে কোর্টে লিখলেন, আমার জামিনদার/গ্যারান্টর হতে চেয়েছিলেন তারা। বিনিময়ে আমাকে বাংলাদেশে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আকুতি জানান কোর্টে। কোনো লাভ হয়নি। কোর্ট নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখল।

আমি আমার মৃত মায়ের মুখ পর্যন্ত দেখতে পারলাম না।

ধর্ম থেকে মন উঠে গেল। আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পুরোপুরি হারিয়ে ফেললাম। বিশ্বাস হারানোর শুরু আরও আগ থেকেই শুরু হয়েছিল বোধ করি। একটা করে বিপদ আসত, আর বিশ্বাসের ভিত্তি আরও নড়বড়ে হতো। মায়ের মৃত্যু বিশ্বাসের ঘর আমার রীতিমতো উপড়ে গেল। এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল আমার অবিশ্বাসের দিনরাত্রি।

গত মাসে আপনি একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলেন। রাত তখন ২টা। কী মনে করে অনেকদিন পরে ধর্মীয় কোনো ভিডিও প্লে করলাম। আমার মনে হলো—একটা ঘোরের ভেতর চলে গিয়েছি। আমি শিশুর মতো কেঁদে গেলাম একটানা; অনেকদিন পর!

মাত্র ১০ মিনিটের একটি ভিডিও আমার হারিয়ে-ফেলা বিশ্বাসের ভিত্তিকে খুঁজে নিয়ে এল এতকাল পরে। আমি ভুল বুঝতে পারলাম নিজের। এতটা কাল সম্পূর্ণ উল্টো পথে হাঁটা আমি প্রাণভয়ে মহান আল্লাহর কাছে সাজদাতে লুটিয়ে পড়লাম। নিজের অতীতের যাবতীয় ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলাম মহান আল্লাহর কাছে। মনে হচ্ছিল—পাথরসম কঠিন হৃদয়ের কোনো এক অংশ দিয়ে সুশীতল পাহাড়ি ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। মনে হচ্ছিল, প্রখর উত্তাপে তপ্ত বালির বুকে হঠাৎ করেই এক পশলা মনোরম বৃষ্টির ছোঁয়া লেগেছে। অনেকটা কাল নিকষ-অন্ধকার যেই ঘরের ভেতরটা ধুলোবালির আস্তরণে ঢাকা ছিল, হঠাৎ আলো আর বাতাসে সেই অন্ধকার জঞ্জাল-সহ পালিয়ে মরল।

আমি আবার নিয়মিত নামায শুরু করেছি ভাই। আমি আমার সকল কিছুর ভার মহান আল্লাহর কাছে দিয়ে দিয়েছি। যা-কিছু হবে—নিশ্চয়ই তিনি ভালোর জন্য করবেন। যা-কিছু হবে না—সেটিও নিশ্চয়ই আমার কল্যাণের জন্যই হবে।

অনেক বড়ো হয়ে গেল ভাই লেখাটি। কষ্ট করে পড়েছেন বলে ধন্যবাদ দিতে চাই না। ঠিক যেমন ধন্যবাদ দিতে চাই না আমার আমূল পরিবর্তনের একটি মাধ্যম হয়ে আসার জন্য। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আপনাকে যোগ্য প্রতিদান দেবেন। আমার জন্য দুআ করবেন যাতে অনেক কাল আগে হারিয়ে-ফেলা রাস্তাটি ফিরে পাবার পরে নিজের ভুলে আবার যেন হারিয়ে না ফেলি।

শেষ করছি একটি অনুরোধ দিয়ে। আপনারা যারা দ্বীন ইসলাম নিয়ে লেখালেখি করেন, অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করতে হয় আপনাদের দেখেছি। কিন্তু ভাই, প্লিজ থেমে যাবেন না। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই কাজ চালিয়ে যান।

কারণ, পৃথিবীর কোনো এক কোনায়, কোনো এক পাপী মানুষকে মহান আল্লাহ আপনাদের সামান্য ৮/১০ লাইনের কোনো একটি লেখার মাধ্যমে ঘোর অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবেন ইন শা আল্লাহ, আপনি হয়তো জানবেনই না।

ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীতে একজন মুসলিমের জন্য এরচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি আর কী হতে পারে ভাই?

ভালো থাকুন নিরন্তর।

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।"

****

'রিয়া' বা লোক দেখানো আমলের কাছ থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করি আমি। সেই ভাইয়ের কাছে আসার গল্পটি অনেক ভাই-বোনের জন্য কল্যাণকর ও শিক্ষণীয় হবে ইন শা আল্লাহ—এই নিয়তেই শেয়ার করলাম।

সালাত

এ কটা সত্য কথা বলি।

আমার অফিস শুক্র ও শনি—দুই দিন বন্ধ থাকে। বাকি পাঁচ দিনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেওয়া। সকালে একটি নির্ধারিত সময়ে আসতে হয় অফিসে। সন্ধ্যায় একটি নির্ধারিত সময়ের আগে অফিস থেকে বের হতেও পারি না। সবার জন্যই এই নিয়ম প্রযোজ্য।

তারপরও প্রায়শই ছুটির দিনে বস ডেকে পাঠান। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অনির্ধারিত সেই ডাকে মা-স্ত্রী-সন্তানের মন খারাপ করে হলেও অফিসে যেতে হয়। একটাই কারণ, অফিস আমাকে বেতন দেয় প্রতি মাসে। সেই টাকায় আমাদের সংসার চলে। অফিসে সময়মতো না গেলে কিংবা ছুটির দিনের অনির্ধারিত ডাকে সাড়া না দিলে অফিস চাকরিতে রাখবে না আমাকে। পরিবার নিয়ে বড়ো বিপদে পড়তে হবে যে আমার!

এইবার একটু ভিন্ন দৃষ্টি থেকে চিন্তা করুন।

মহাবিশ্বের প্রতিপালক, অসীম দয়ালু আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তারপর থেকেই কোনো রকম টাকা-পয়সা খরচ না করে, আই রিপিট, কোনো অর্থ খরচ না করে মহিমান্বিত সৃষ্টিকর্তার দান হিসেবে আলো-বাতাস-পানি গ্রহণ করছি। চোখ দুটো দিয়ে পৃথিবী দেখছি। হাত-পা ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত কাজ করছি। কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করছি।

খুব সাধারণ ভাষায় বললে, তাঁর দেওয়া অসংখ্য নিয়ামাতের বিনিময় হিসেবে মহান রাব্বুল আলামীন দিনে ৫টি নির্ধারিত সময়ে তাঁর ইবাদাত করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।

এই ৫ বার সালাত আদায় করতে সর্বোচ্চ ১ ঘণ্টা সময় লাগে আমাদের। ২৪ ঘণ্টায় মাত্র ১ ঘণ্টা মহান আল্লাহর জন্য। সেটিও ছুটির দিনে হুটহাট করে অনির্ধারিত সময়ে অফিসে ডাক দেবার মতো না। সবার জন্য এই ৫ ওয়াক্ত নামাজের সময় পূর্ব-নির্ধারিত ও অভিন্ন।

বড়ো আফসোস! ২৪ ঘণ্টায় মাত্র ১ ঘণ্টা সময়ও আমরা মহিমান্বিত আল্লাহর জন্য ব্যয় করি না। বড়ো আলস্য আমাদের!

খেয়াল করুন, অফিসে আমরা সময়-শ্রম দিই, বিনিময়ে অফিস আমাদের টাকা দেয়। এখানে উভয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত। মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে সেটিও প্রযোজ্য নয়! পুরো পৃথিবীর মানুষ তাঁর আদেশের বিপরীতে গেলেও কোনো কিছুই আসে-যাবে না তাঁর।

এই যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১ ঘণ্টা ব্যয় করতেও আমাদের অনাগ্রহ, এই অনাগ্রহ কি আপনার অফিস, ব্যবসা, কিংবা স্কুলের ক্ষেত্রে দেখাতে পারতেন? পারতেন না। কারণ অফিস আপনাকে চাকুরিচ্যুত করত। স্কুল থেকে আপনাকে বের করে দেওয়া হতো। কিন্তু পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ তাআলা আমাদের অবাধ্যতার জন্য অক্সিজেন, পানি, আলো ইত্যাদি বন্ধ করে দেন না। কিংবা হঠাৎ করে চোখের জ্যোতি, মুখের আওয়াজ, পায়ে চলার শক্তি কেড়েও নেন না। আল-হামদুলিল্লাহ!

সফলভাবে চাকরি শেষে অবসরে যাবার সময়ে পুরস্কার হিসেবে পেনশন পাওয়া যায় কিছু চাকরিতে (সবগুলোতে না)। ৩৫ বছর চাকরি করে খুব বড়োজোর আর ৪০ বছর বেঁচে থাকব আমরা সেই পুরস্কার ভোগ করার জন্য। শুধু বসে বসে খেলে সেই পুরস্কারও নিশ্চিত শেষ হয়ে যাবে একদিন। অথচ মহান রাব্বুল আলামীন এর পুরস্কার অসীম কালের জন্য। মৃত্যু-পরবর্তী অসীম সময়ের তুলনায় পৃথিবীর জীবন অতি তুচ্ছ। সেই অসীম সময়ের জন্য জান্নাত হলো মহান আল্লাহ তাআলার পুরস্কার। এই পুরস্কার শেষ হবে না, কেড়ে নেওয়াও হবে না।

দুই দিন ইচ্ছে করে অফিস ফাঁকি দিলে তৃতীয় দিন অফিসে গিয়ে নিজ থেকেই একটু বেশি একনিষ্ঠ থাকি আমরা কাজের প্রতি। কিছুটা অপরাধবোধ হলেও কাজ করে মনে। তাই নয় কি?

আমাদের দুর্ভাগ্য, মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে সেই অপরাধবোধও জেগে ওঠে না আমাদের মনে।

কেন?

তিনি পরম করুণাময় বলেই?

তিনি অসীম দয়ালু বলেই?

তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমাশীল বলেই?

> "আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের বাড়াবাড়ি করার জন্য সাথে সাথে পাকড়াও করতেন তা হলে ভূপৃষ্ঠে কোনো একটি জীবকেও ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি সবাইকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর যখন সেই সময়টি এসে যায় তখন তা থেকে এক মুহূর্তও আগে পিছে হতে পারে না।"[১৪]

এতকিছুর পরেও কি আমরা দিনে ৫ বার সালাত আদায় করার মতো মৌলিক প্রার্থনা থেকে দূরে থাকব?

সিদ্ধান্ত আপনার।

অতি সহজ এই যুক্তি নিজের এবং অনেকের জন্য অত্যন্ত কার্যকারী হয়েছে। যদি আপনার কাছেও কার্যকর মনে হয়, তবে দয়া করে অন্যদের কাছে এ কথাগুলো পৌঁছে দিন। অন্তত সালাতের মতো প্রাথমিক অথচ গুরুতপূর্ণ ইবাদাত শুরু করতে পারবেন আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা।

****

"সালাতে কোনোভাবেই মনোযোগ স্থির থাকে না"—আমাদের অনেক ভাই-বোনদের এই কমন সমস্যাটি হয়। হয়তো এই কারণেই অনেকের সালাত আদায় করতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সময় লাগে। কীভাবে সালাতে মনোযোগ বাড়াতে পারি আমরা?

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "তোমরা সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করো। কারণ যেই ব্যক্তি সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করবে, সে সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে বাধ্য। এবং সেই ব্যক্তির মতো সালাত আদায় করো, যে মনে করে এই সালাতের পরে আর কোনো ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ভাগ্য তার হবে না।"[১৫]

আবূ আইয়ূব আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু-কে উপদেশ দেওয়ার সময়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

[১৪] সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৬১
[১৫] সিলসিলা সহীহাহ, ১৪২১

"যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তখন তুমি বিদায়ী-সালাত (এমনভাবে যাতে এই সালাতই জীবনের শেষ সালাত) আদায় করবে।"[১৬]

হে মুসলিম ভাই-বোনেরা!

সালাত আদায়ের সময় আমাদের এমনভাবে মন স্থির করা চাই, যাতে আমাদের মনে হয়—জান্নাত আমাদের ডান পাশে, জাহান্নাম আমাদের বামে। পুলসিরাত আমাদের পায়ের নিচে, মাথার ওপরে পাহাড়সম পাপরাশি ভেঙে পড়বার অপেক্ষায়। আর মালাকুল মাউত আমাদের পেছনে রূহ টেনে নেওয়ার অপেক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে।

এই সালাতই আমাদের শেষ সৎকাজ। সালাত শেষেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সত্যের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের; 'মৃত্যু'। আমাদের আমলনামা বন্ধ হয়ে যাবে। যাবতীয় হাহাকার কিংবা আফসোস কোনো কাজে আসবে না।

ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীতে এই সেই শেষ মুহূর্ত, এই সেই শেষ ক্ষণ। এবং এই সালাতই আমাদের অসীম সময়ের জন্য নির্ধারিত আবাস জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ফয়সালা করে দেবে!

ওয়াল্লাহি, আমরা কি তখন শেষ সালাতেও তাড়াহুড়ো করব?

আল্লাহ তাআলার সামনে জীবনের শেষ সাজদা কি আমরা দীর্ঘ এবং আবেগঘন করে তুলব না?

শেষের শুরুটা ভালো করার জন্য মনকে স্থির করব না আমরা?

---

[১৬] আহমাদ, ৪১২; আলবানি, আল-জামি', ৭৪২

অধঃপতনের ব্যাকরণ

১

দুনিয়ার জন্য রিযকের চিন্তা-পেরেশানি সম্ভবত আমাদের মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখার অন্যতম মূল কারণ। চলুন, একটি ঘটনা পড়ে নিই আমরা। ৫ মিনিট লাগবে বড়োজোর। গল্পের মতোই পড়লেন না হয়।

আনুমানিক ২০০ হিজরির দিকের ঘটনা। ইরাকের বসরা শহর। শহরের একজন বড়ো আলিম ছিলেন আবূ সাঈদ আবদুল মালিক ইবনু কুরাইব আসমাঈ বাহিলি। বিখ্যাত কবি ও ভাষাবিদও ছিলেন তিনি। ছিলেন খলীফা হারুনুর রশীদের দুই পুত্র আল-আমীন ও আল-মামুনের শিক্ষক। আসমাঈ নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি।

আসমাঈ একদিন বসরা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাস্তায় এক বেদুইনের সাথে দেখা। নাম-পরিচয় জানার পরে তাকে মহান আল্লাহর কালাম থেকে কিছু অংশ শোনানোর অনুরোধ করে রুক্ষ ও কর্কশভাষী সেই বেদুইন। আসমাঈ সূরা আয-যারিয়াত থেকে পড়া শুরু করে সূরার ২২ নাম্বার আয়াতে পৌঁছলেন—

“আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা, আর যা তোমাদের ওয়াদা করা হয়েছে।”

বেদুইন থামিয়ে দিল তাকে।

- যথেষ্ট! এটি কি আল্লাহর কথা?

- জি, এটি আল্লাহর কথা এবং মহান আল্লাহ এটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি নাযিল করেছেন।

বেদুইন স্তব্ধ হয়ে গেল। সে উঠে গিয়ে তার উটটি জবাই করল এবং আসমাঈর সহায়তায় উটের গোস্ত শহরের সব দরিদ্র মানুষদের দান করে দিল। আর তারপর নিজের তরবারি এবং ধনুক ভেঙে ফেলে মরুভূমির পথে হাঁটা শুরু করল। মুখে সূরা আয-যারিয়াতের সেই ২২ নম্বর আয়াত। সে বারবার এই আয়াতটি পড়তে পড়তে যাচ্ছিল—"আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা, আর যা তোমাদের ওয়াদা করা হয়েছে।"

বেদুইনটি আয়াতটিকে মন থেকে উপলব্ধ করতে পেরেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, যেই রিযক নিয়ে তার এত চিন্তা-পেরেশানি, সেটি মহান আল্লাহর কাছেই রয়েছে। যেই রিযকের খোঁজে উদয়াস্ত নিজেকে হয়রান করে ফেলছিল সে, সেই রিযক তো পূর্ব নির্ধারিত। তা হলে এইভাবে তিলে-তিলে নিজেকে নিঃশেষ করার কী অর্থ থাকতে পারে।

এই পর্যায়ে আসমাঈ আফসোস করতে লাগলেন—হায় আফসোস! আমার ঈমান কেন এই বেদুইনের মতো শক্ত না? এই আয়াত শুনে মহান আল্লাহর প্রতি যেই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলো এই বেদুইনের, মুখস্থ জানার পরেও আমার বিশ্বাস কেন এতো সুদৃঢ় হলো না?

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী! ঘটনা এখানেই শেষ না।

বেশ অনেক বছর পরের কথা।

আসমাঈ হাজ্জের সফরে গেছেন খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে। হঠাৎ করেই নিজের নাম শুনতে পেলেন তিনি। কেউ একজন জোরে জোরে ডাকছে তাকে। আসমাঈ পেছন ফিরে আবিষ্কার করলেন—সেই বেদুইন তাকে ডাকছে। অনেক বছর পর আবার দেখা তার সাথে। চেহারায় সেই কাঠিন্য নেই, নেই ব্যবহারে সেই রুক্ষতা।

কুশল বিনিময়ের পর আসমাঈকে বেদুইন আবার অনুরোধ করল আল-কুরআনুল কারীম থেকে আরও কিছু পড়ে শোনাতে। আসমাঈ আবারও সেই সূরা আয-যারিয়াত থেকে পড়া শুরু করলেন এবং সেই ২২ নাম্বার আয়াতে —"আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা, আর যা তোমাদের ওয়াদা করা হয়েছে।" বেদুইন তাকে বলল, 'মহান আল্লাহ যা বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি এটিকে সত্য হিসেবেই পেয়েছি। আপনি পড়তে থাকুন আমার জন্য, আরেকটু পড়ুন।'

আসমাঈ পরের অর্থাৎ ২৩ নাম্বার আয়াতটি পড়লেন,

"তাই আসমান ও যমীনের মালিকের শপথ, একথা সত্য এবং তেমনই নিশ্চিত যেমন তোমরা কথা বলছ।"

এ আয়াতে لَحَقٌّ – 'লা হাক্ব' এর যেই লাম (ل), সেটা হলো লাম আত-তাওকীদ, সুনিশ্চিতকরণ। প্রথমে মহান আল্লাহর শপথ ব্যবহার করে নিশ্চিত করা হয়েছে রিযক এর ওয়াদার বিষয়টি। মহান আল্লাহর শপথই যেখানে যথেষ্ট, তারপরেও শপথের পাশাপাশি লাম আত-তাওকীদ ব্যবহার করে আরও বেশি সুনিশ্চিত করা হয়েছে বিষয়টি।

বেদুইনটি হতবাক হয়ে পড়ল এবং ২৩ নাম্বার আয়াতটি তিলাওয়াত করল। সে বিপুল বিস্ময় নিয়ে আসমাঈকে জিজ্ঞেস করল, 'কারা সেই নির্বোধ, যারা মহান আল্লাহর ওয়াদাকে অবিশ্বাস করেছিল, তাঁকে এতটাই ক্রোধান্বিত করেছে—যার কারণে মহান আল্লাহকে (আল-জালীল, আল-কারীম, আল-কাইয়ূম) নিজের নামে শপথ করতে হলো? কারা সেই অর্বাচীন?'

বেদুইন আসমাঈর সামনেই সূরা আয-যারিয়াতের ২৩ নাম্বার আয়াতটি তিলাওয়াত করতে থাকল এবং ৩য় বার তিলাওয়াত করার সময়ে সেই স্থানেই মৃত্যুবরণ করল!

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা।

এভাবেই একটি বা দুটিমাত্র আয়াত কোনো কোনো মানুষের জীবনের মোড়কে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে মহান আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়, সুবহানাল্লাহিল আযীম।[১৭]

২

পঞ্চম আব্বাসীয় খলীফা হারুন-উর-রাশীদ আসছেন পবিত্র হাজ্জ পালন করতে। সমগ্র আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ হাজ্জের সময় জড়ো হয়েছেন মক্কা আল মুকাররমায়। এদের অনেকের ইচ্ছে—হাজ্জের সময়ে খলীফার সাথে একবার দেখা করে নিজেদের প্রয়োজন মেটানার চেষ্টা করবেন। এক বেদুইন আরব এসেছেন তার বালক পুত্রকে সাথে নিয়ে। হতদরিদ্র বেদুইনও খলীফার সাথে দেখা করে নিজের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর কথা মাথায় রেখেছিলেন। বাইতুল্লাহ'র প্রাঙ্গনে একদিন সেই সুযোগ পেয়েও গেল বেদুইন। কিন্তু খলীফা হারুন-উর-রাশীদকে দেখে থমকে গেলেন তিনি!

বেদুইন খুব কাছ থেকে দেখলেন—প্রতাপশালী, ক্ষমতাবান খলীফা হারুন-উর-রশীদ বাইতুল্লাহ কাবার গিলাফ ধরে আছেন। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলছেন আর শিশুর মতো অঝোরে কাঁদছেন।

বেদুইনপুত্র তার বিস্মিত বাবাকে খলীফার সাথে দেখা করার কথা মনে করিয়ে দিল।

[১৭] ঘটনাটি ইমাম কুরতুবি ও ইবনু কুদামা রহিমাহুমাল্লাহ সনদ-সহকারে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু বাবার মন তখন অন্য কোনো চিন্তায় মগ্ন। আরেকবার তাড়া দেওয়ার পর বেদুইন তার সন্তানকে বললেন, 'তাকিয়ে দেখো বাবা, পৃথিবীর বাদশাহ কীভাবে কেঁদে চলেছেন বিশ্বচরাচরের বাদশাহ'র দরবারে! আমার মালিক এবং তাঁর মালিক তো অভিন্ন। আমার কী হয়েছে যে বিশ্বচরাচরের বাদশাহ'র দরবারে নিজের প্রয়োজনের কথা না বলে পৃথিবীর বাদশাহ'র কাছে সেই কথা বলব? অবশ্যই আমার প্রয়োজনের কথা সেই পালনকর্তার কাছে বলব যিনি সবকিছুর অমুখাপেক্ষী।'

বলা বাহুল্য, হতদরিদ্র সেই বেদুইনের যাবতীয় প্রয়োজন মহান আল্লাহ তাআলা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

নিশ্চয়ই চিন্তাশীলদের জন্য এই ঘটনার মধ্যে উত্তম শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

৩

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষের সবচেয়ে বড়ো পেরেশানি সম্ভবত রিযক নিয়ে। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে।

রিযক বলতে শুধুই চাকরি, ব্যবসা, অর্থ বা সম্পদকে বোঝায় না। সন্তানও একটি রিযক। অবসর সময়ও একটি রিযক। সুস্বাস্থ্যও একটি রিযক। ইবাদাতের একনিষ্ঠ আগ্রহও একটি রিযক হতে পারে। বিয়ের জন্য নেককার সঙ্গীও হতে পারে একটি রিযক।

আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা কমপক্ষে ৪১টি সূরায় ১০৫বার রিযকের বিষয় উল্লেখ করেছেন। রিযকের বিষয়ে আমাদের পেরেশানি থাকতে পারে, ফিকিরও থাকবে নিশ্চয়ই। কিন্তু পূর্ণ আস্থা ও ইয়াকীন রাখতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপর। তিনি 'খাইরুর রযিকীন'—সর্বোত্তম রিযকদাতা। শুধুমাত্র তাঁর কাছেই সামগ্রিকভাবে রিযকের জন্য মুখাপেক্ষী আমরা সবাই। আমাদের চেষ্টাটুকু আমরা করব। তবে এই নিয়ে 'অতিমাত্রায়' দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া এবং হা-হুঁতাশ করা প্রকারান্তরে মহান আল্লাহর ওয়াদার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না আনার নামান্তর বৈকি।

আপনি যেই সুদের চাকরিটি ছাড়তে পারছেন না, আপনি যেই হারামের চাকরিটি ছেড়ে দিবেন বলে ঠিক করেও চালিয়ে যাচ্ছেন, চাকরি বা সন্তান-লাভের জন্য বিভিন্ন পীর-ফকিরের কাছে দৌড়াচ্ছেন কিংবা বিয়ে হচ্ছে না বলে দেয়ালে কপাল ঠুঁকছেন—এইসব কিছুই মূলত "সোজা কথায়" আর-রাযযাক-এর ওপর আপনার পরিপূর্ণ আস্থা না থাকার ফল।

কথাটি তিক্ত হতে পারে, কিন্তু এটিই ধ্রুব সত্য। আপনি যদি সর্বোত্তম রিযকদাতা হিসেবে আল্লাহ তাআলাকে মেনে নিতেই পারেন, তবে আপনার পেরেশানির মাত্রা এই পর্যায়ে পৌঁছাত না। হারাম চাকুরি ছাড়লে কী খাবেন, কীভাবে চলবেন—এই চিন্তাগুলো মাথা থেকে হারিয়ে যেত নিমেষেই। নিজের চেষ্টার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে বাকিটুকুর জন্য তখন আপনি শুধু আল্লাহ তাআলার ওপরই নির্ভর করতেন।

দুঃখজনক ও তিক্ততম সত্য—আমরা অধিকাংশরাই সেটি করতে পারি না। আল্লাহ সহজ করুক।

> "(হে মুহাম্মাদ) বলুন, আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।"[১৮]

আল্লাহ তাআলা আমাদের ওই "অধিকাংশদের" থেকে পৃথক করে "অল্প-সংখ্যকদের" কাতারে শামিল করুক।

মহান আল্লাহ সহজ করুন আমাদের জন্য।

---

[১৮] সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৬

১০

ব্যর্থানুবাদ সংকলন[১৯]

১

বিশাল প্রতিপত্তিশালী এক রাজা পরিদর্শনে বের হয়েছেন, সাথে সভাসদের লোকেরা।

ঘুরতে ঘুরতে এক বাজারে পৌঁছালেন তিনি। রাজার সম্মানে বাজারে উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলেও এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক দাঁড়াবার সৌজন্য দেখালেন না। ক্ষুব্ধ রাজা সওদা থেকে নেমে একা হেঁটে গেলেন বৃদ্ধের কাছে।

– ওহে ভিক্ষুক! কীসের এত গর্ব তোমার? আমাকে দেখেও তুমি কেন দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলে না?

– আপনাকে একটা ঘটনা বলি। আপনার বাবা যখন রাজা, তখন একদিন এ রাজ্যে এসেছিলেন তিনি। আমি তখনও এত বৃদ্ধ হইনি। আমার বাম-পাশের খেজুর গাছের নিচে তখন আরেকজন অতি বৃদ্ধ ভিক্ষুক বসতেন। সেদিন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করেছিলাম। আমি কি ঘটনাটি বলব আপনি বিরক্ত বোধ করছেন না তো?

– না, আমি শুনছি।

– তার কিছুদিন পরেই আপনার বাবার মৃত্যু হয়। একইদিনে পাশের বৃদ্ধ ভিক্ষুকও মারা যান। আপনার বাবার সমাধির পাশেই একইদিনে তাকেও সমাহিত করি আমরা। সে বছর প্রচণ্ড বন্যা নামে রাজ্যে। অনেকদিন পরে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরে আমরা জানতে পারি—আপনার বাবার সমাধির দেয়াল ধসে গেছে। আরও অনেকের সাথে

[১৯] বিদেশী গল্প ও লেকচার থেকে অনূদিত

আমিও দেখতে যাই সমাধি। বন্যার পানির স্রোতে সব গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।

আমরা অবাক হয়ে দেখি—আপনার বাবার হাড়গোড় আর সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকের দেহাবশেষ এক সাথে মিশে গেছে। কোনোভাবেই আলাদা করা সম্ভব হয়নি তাদের দুজনের দেহাবশেষ। নতুন করে দেওয়া সমাধিতে ঠিক কার দেহাবশেষ রাখা হলো সেটি নিশ্চিত করা যায়নি।

একটু থামলেন বৃদ্ধ ভিক্ষুক। কিছুটা সময় নিয়ে ক্লান্ত গলায় শেষ করলেন, 'মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগের সেই প্রবল প্রতাপশালী রাজা আর বৃদ্ধ ভিক্ষুকের মধ্যকার প্রকৃত বাস্তবতা মৃত্যুর কিছুদিন পরেই সৃষ্টিকর্তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন আমাদের। একই সমাধিতেই চিরদিন থাকবেন তারা। আপনার কি মনে হয়—এই অসাধারণ ঘটনা নিজ চোখে দেখার পরেও আমার আপনাকে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করার প্রয়োজন আছে? কে জানে, দুদিন পর হয়তো একই সমাধিতে শায়িত থাকব আমরা!'

সামান্য এক বৃদ্ধ ভিক্ষুকের কাছ থেকে অসামান্য জ্ঞান নিয়ে ফিরে গেলেন সেই প্রতাপশালী রাজা।

পাঠকবৃন্দ! নিতে পারলাম কি আমরা কিছু শিক্ষা?

২

আব্বাসীয় খেলাফতের সময় বাগদাদে একজন সুবিজ্ঞ শিক্ষক বাস করতেন। অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য মানুষজন তাঁকে অসম্ভব পছন্দ ও সম্মান করত।

একদিন স্থানীয় এক লোক হন্তদন্ত হয়ে শিক্ষকের কাছে এসে একটি অতি জরুরি কথা বলতে চাইলেন।

- জনাব, 'খুব ভালো মানুষ' হিসেবে জানেন আপনি, এমন একজন বন্ধুর বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়ার জন্যই ছুটে এলাম আপনার কাছে।

মুচকি হেসে লোকটিকে থামতে বললেন শিক্ষক,

- আমার বন্ধুর বিষয়ে আপনি এত কষ্ট করে আমাকে ঘটনাটি জানাতে এসেছেন, আপনার কথা অবশ্যই শুনব। কিন্তু তার আগে আমার একটি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে আপনাকে।

- অবশ্যই জনাব। আপনাকে পছন্দ করি বলেই খবরটি দিতে এসেছি। আমি যে-কোনো পরীক্ষা দিতে রাজি আছি।

শিক্ষক পরীক্ষা নেওয়া শুরু করলেন,

- আপনাকে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর নাম দিয়েছি 'তিন স্তর'-এর পরীক্ষা। প্রথম স্তর হলো 'সত্যতা'। আপনি কি ১০০ ভাগ নিশ্চিত যে, ঘটনাটি সত্য?

-জি জনাব... না মানে, ঠিক ১০০ ভাগ নিশ্চিত না। আমি আসলে একজনের কাছে শুনেছি ঘটনাটি। কিন্তু যার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি খুব ভালো মানুষ। মিথ্যা বলার মানুষ না তিনি।

- আমি শুধু জানতে চাইছি আপনি শতভাগ নিশ্চিত কি না ঘটনার সত্যতার বিষয়ে।

- জি না জনাব।

- আচ্ছা। এবার দ্বিতীয় স্তর হলো 'প্রকার'। আপনি যেই ঘটনাটি বলতে চাচ্ছেন, সেটি কি ভালো-জাতীয় কিছু?

- না জনাব। ঘটনায় খারাপ খবর আছে। সে কারণেই তো দৌড়ে এলাম আপনার কাছে।

- তার মানে হচ্ছে, আপনি আমাকে একজনের বিষয়ে এমন একটি খবর দিতে চাচ্ছেন যেটি মূলত খারাপ ধরনের ঘটনা এবং সেই খারাপ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কেও আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত নন। বেশ!

এবার পরীক্ষার শেষ স্তর 'উপকারিতা'। আপনি যেই ঘটনা বলতে চাচ্ছেন সেটি কি আমার জন্য কোনোভাবে উপকারী? কোনো উপকার কি হবে আমার সেই তথ্য শুনে?

- উমমম না, ঠিক উপকারী না। তবে জনাব, কথা হলো, জেনে রাখলে তো আর ক্ষতি নেই।

শিক্ষক এই পর্যায়ে পুরোপুরি থামিয়ে দিলেন লোকটিকে। মিষ্টি হেসে উপসংহার টানলেন, 'তার মানে হচ্ছে, আপনি আমার কাছে আমার এক বন্ধুর বিষয়ে এমন একটি তথ্য দিতে চাচ্ছেন যেটি না শতভাগ সত্য, না ভালো এবং না উপকারী!! আদৌ ঘটনাটি আমাকে বলার দরকার আছে কি? আমার মনে হয় না।'

পাঠকবৃন্দ! প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অনেক কথাই বলি আমরা। বাগদাদের সেই বিজ্ঞ শিক্ষকের তিন স্তরের পরীক্ষাটি (সত্যতা, ভালো-মন্দের প্রকার ও উপকারিতা) কিন্তু নিজের মনেই করে নিতে পারি আমরা।

নিশ্চিত থাকুন, আমাদের অনেক আপাত 'অতি প্রয়োজনীয়' কথাবার্তা পরবর্তীকালে 'নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়' মনে হবে!

৩

সদরঘাট এর শেষ মাথায় থাকেন এক ইমাম সাহেব।

প্রতিদিন সকালে একই বাস ধরে পাটুয়াটুলী আসেন তিনি। বাসের সব স্টাফদের মুখ চেনা তার। বাস স্টপেজ থেকে হাঁটার দূরত্বে মাসজিদ।

সেদিন সকালেও যথারীতি একই বাসে করে রওনা করলেন ইমাম সাহেব। ভাড়া দেওয়ার পরে হঠাৎ খেয়াল করলেন বাসের স্টাফ ভুল করে ২০ টাকা বেশি দিয়ে ফেলেছে তাকে।

'এই অতিরিক্ত ২০ টাকা স্টাফকে ফেরত দেওয়া উচিত আমার। এই অর্থের ওপরে আমার হক নেই'—মনে মনে ভাবলেন ইমাম সাহেব।

ঠিক একইসাথে নিজের ভেতরের খারাপ সত্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—আরে বাদ দাও, মাত্র ২০ টাকা। আমি তো আর জোর করে নিইনি স্টাফের কাছ থেকে। হয়তো আল্লাহর ইচ্ছে, এই ২০ টাকা আমি পাব।'

নিজের প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করতে করতে গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন ইমাম সাহেব । বাস থেকে নামার ঠিক আগ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ভুল করে বেশি-পাওয়া ২০ টাকা ফেরত দিয়ে দিলেন বাসের স্টাফকে ।

২০ টাকা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সেই স্টাফ। তারপর নিচু গলায় ইমাম সাহেবকে বললেন, 'আমি একজন অমুসলিম। আপনি বোধহয় সামনের ওই মাসজিদের ইমাম। বেশ কিছুদিন ধরেই আমি আপনার কাছে গিয়ে ইসলাম ধর্মের বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম। তার আগে কেন জানি খুব দেখতে ইচ্ছে হলো আপনাকে ২০ টাকা অতিরিক্ত দিয়ে, কী করেন আপনি এটি দিয়ে। ধন্যবাদ আপনাকে, খুব তাড়াতাড়ি হয়তো যাব আপনার কাছে।'

বাস থেকে নেমেই রাস্তার পাশের ফুটপাতে বসে পড়লেন ইমাম সাহেব । কাঁপা-কাঁপা গলায় মহান আল্লাহ পাকের অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন তিনি, 'আল-হামদুলিল্লাহ! আরেকটু হলেই আমি এই সামান্য ২০ টাকার বিনিময়ে একজন বিধর্মীর কাছে ইসলামকে বিক্রিই করে দিচ্ছিলাম!'

*****

পাদটীকা : আপনি হয়তো জানবেনই না, আপনার নিজের প্রত্যেকটি কাজের কী ধরনের প্রভাব পড়ছে আশেপাশের মানুষদের ওপর। এই ঘটনার মতো আপনিই হয়তো

অপরিচিত, ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সামনে ইসলাম ধর্মের একমাত্র ঝাণ্ডাধারী মুসলিম, একমাত্র মূর্ত উদাহরণ!

৪

জনৈক মুফতি : জি বোন, টিভির সাউন্ড কমিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন।

জনৈক বোন : শাইখ! আমার স্বামী, পুত্র ও কন্যার ঘুম অত্যন্ত গভীর। ফজরের সালাতের সময় কোনোভাবেই ওদের ঘুম ভাঙাতে পারি না। কী করলে ফজরের সালাতের সময় ওদের ঘুম থেকে ডেকে তুলতে পারব?

মুফতি : বোন, যদি আপনার ঘরে কখনও আগুন লাগে এবং আপনার পরিবারের সদস্যরা যদি তখন ঘরের ভেতর ঘুমাতে থাকেন, আপনি কী করবেন তখন?

বোন : অবশ্যই তাদের সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তুলব।

মুফতি : কিন্তু ওদের ঘুম তো অত্যন্ত গভীর—আপনিই বললেন।

বোন : তারপরেও যে-কোনো মূল্যে ডেকে তুলব ওদের। জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার!

মুফতি : সুবহানাল্লাহ। বোন, আপনি পৃথিবীর আগুন থেকে নিজ পরিবারের সদস্যদের বাঁচানোর জন্য তাদের গভীরতম ঘুম থেকে ডেকে তুলতে যা যা করবেন, ন্যূনতম সেই কাজগুলোই করুন জাহান্নামের আগুন থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য। যদিও হিসেব-মতো সেই কাজগুলোর ৭০ গুণ বেশি চেষ্টা করা উচিত আপনার। আবূ হুরায়রা রদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র।"[২০]

---

[২০] বুখারি, ৭৫

মোহ

১

এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সাথে কথা হচ্ছিল আজ।

ভদ্রলোক আমেরিকা থাকেন। দেশে এসেছেন বেশ কিছুদিন হয়। ঢাকা শহরের বনেদি এলাকায় ৫ কাঠার একটি জায়গা কিনেছিলেন। সেটির মালিকানা বুঝে-পাওয়া-সংক্রান্ত ঝামেলার কারণে দেশে আসা ও বেশ কিছুদিন থাকা। আমি মনোযোগী শ্রোতা কি না, জানি না। তবে ভদ্রলোক প্রায় দেড় ঘণ্টা সময়ের পুরোটাই ব্যয় করলেন সেই জমির মালিকানা-সংক্রান্ত যাবতীয় ঝামেলার কথা বলে।

ভদ্রলোক চলে যাবার পরে প্রথম যে কথা মনে হয়েছে—আমার জমিও নেই। জমির মালিকানা-সংক্রান্ত ঝামেলাও নেই। আল-হামদুলিল্লাহ।

নিজের জাহিলিয়াতের (অজ্ঞতার) সময়ে হলে হয়তো ভদ্রলোকের মতো 'মাথা গোঁজার ঠাঁই' না থাকার কারণে হা-হুঁতাশ করতাম। দ্বীন ইসলাম আমাকে শিখিয়েছে—দুনিয়াবি আঙুর ফল সব সময় টক না, মিষ্টিও হয়। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য শুধু।

অতি সচ্ছলতা এবং অতি দরিদ্রতা থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

২

দুজন মানুষ। একজন পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-সাচ্ছন্দ্যে আছেন; কিন্তু দ্বীনের ওপরে নেই। অন্যজন পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃসহ কষ্ট-দুর্ভোগের মধ্যে বেঁচে আছেন; কিন্তু দ্বীন আঁকড়ে আছেন এত কষ্টের মধ্যেও।

কিয়ামাতের দিনে এই দুজনের অনুভূতি শুনুন।

আনাস ইবনু মালিক রদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> "জাহান্নামের উপযোগী, অথচ দুনিয়ায় সর্বাধিক সাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী ব্যক্তিকে কিয়ামাতের দিন আনা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে একবার অবগাহন করিয়ে বলা হবে—হে আদম-সন্তান! দুনিয়াতে আরাম-আয়েশ কখনও তুমি দেখেছ কি? কখনও তুমি সাচ্ছন্দ্য অবস্থায় দিনাতিপাত করেছেন কি?

সে বলবে, আল্লাহর কসম! হে আমার প্রতিপালক! না, কখনও সুখ-সাচ্ছন্দ্য দেখিনি।

তারপর জান্নাতের উপযোগী, অথচ দুনিয়ায় সর্বাধিক খারাপ অবস্থা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে আনা হবে। তারপর তাকে জান্নাতে একবার অবগাহন করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম-সন্তান! কখনও তুমি কষ্ট দেখেছ কি? কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থায় দিনাতিপাত করেছেন কি?

সে বলবে, আল্লাহর কসম, হে আমার প্রতিপালক! কখনও আমি কষ্টের সাথে দিনাতিপাত করিনি এবং দুঃখ কখনও দেখিনি।"[২১]

আল্লাহু আকবার! মাত্র একবার জাহান্নামে অবগাহন করার কষ্ট-দুর্দশা পৃথিবীতে সর্বাধিক সাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী ব্যক্তিকেও তার যাবতীয় সুখ-সাচ্ছন্দ্যের স্মৃতিকে বেমালুম ভুলিয়ে দেবে। একইভাবে, পৃথিবীতে সর্বাধিক খারাপ অবস্থায় দিন কাটানো ব্যক্তি মাত্র একবার জান্নাতে অবগাহন করার স্বর্গীয় অনুভূতি উপভোগের কারণে সারা জীবনের যাবতীয় কষ্ট-দুঃখ-দুর্ভোগ পুরোপুরি ভুলে যাবে।

তা হলে কীসের মোহে অসীমকে পায়ে ঠেলে নিরন্তর ছুটে চলেছি আমরা ?

---

[২১] মুসলিম, ৬৮২৯

৩

সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু যখন রোগশয্যায়, সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখতে যান।

একপর্যায়ে সালমান রদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করলেন। সাদ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আবূ আবদুল্লাহ! আপনি কাঁদছেন কেন? রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাউজে কাওসারের নিকট তাঁর সাথে আপনি মিলিত হবেন।"

সালমান রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি মরণ-ভয়ে কাঁদছি না। কান্নার কারণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম যেন একজন মূসাফিরের সাজ-সরঞ্জাম থেকে বেশি না হয়। অথচ আমার কাছে এতগুলি জিনিসপত্র (এক বর্ণনাতে জিনিসপত্রকে 'সাপ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) জমা হয়ে গেছে।"

সাদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "সেই জিনিসগুলি একটি বড়ো পেয়ালা, তামার একটি থালা ও একটি পানির পাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।"[২২]

আমরা কী অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি? নিজেদের অবস্থা নিজেরাই যাচাই করে নিতে পারি আমরা।

[২২] মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা-১

স্মরণিকা

১

সিসি টিভির ফুটেজ দেখে নগদে চোর ধরতে দেখেছেন কখনও? আমি দেখেছি।

বনানীর একটি দোকানের ভেতরে ঘটনা। মানুষজন জটলা করে সিসি টিভির ফুটেজ দেখছে। জটলার মধ্যে চোর বাবাজিও ছিলেন। নিজের শৈল্পিক চুরি সিসি টিভির ক্যামেরায় ধারণ করা হয়ে গেছে—এই বিষয় টের পেতেই হাসিমুখ করে জটলা থেকে বের হয়ে কেটে পড়তে চেয়েছিলেন চোর বাবাজি। লাভ হয়নি। উপস্থিত জনতা হাসিমুখকে প্রকাশ্যে হাঁড়িমুখ করে দিল।

আমি দেখেছি—অপরাধের অভিযোগ তোলার পর থেকে বড়ো গলায় কথা-বলতে-থাকা মানুষের মুখের চিত্র আর ফুটেজ দেখে অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরে অপরাধীর মুখের চিত্রের মধ্যে কী বিশাল পার্থক্য!

এবার একটু কষ্ট করুন। চেষ্টা করুন সেই অপরাধীর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করার। কেমন লাগবে নিজের কাছে? অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে অপরাধীর সেই জায়গায় কল্পনা করতে পারি না আমি। কী ভয়ংকর বিব্রতকর ও লজ্জাকর মুহূর্তই না হবে নিজের জন্য!

পাঠকবৃন্দ! কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ তাআলা যখন পৃথিবীর সকল মানুষের সামনে, আমার রাসূল মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে, অন্যান্য রাসূলদের ও তাঁদের উম্মাতের সামনে আমাদেরকে আমলনামা হাতে দিবেন,

কেমন লাগতে পারে আমাদের তখন?

নিকষ-অন্ধকারে কিংবা নিজের অফিসের রুমে একাকী অথবা প্রাণপ্রিয় বন্ধুর সাথে চোখ বন্ধ করে সেরে ফেলা দুষ্কর্মগুলো যখন সিসি টিভির ফুটেজের মতো সবার সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে, কেমন লাগবে তখন?

নিজের মনের মুনাফিকি চিন্তাধারার নেগেটিভ ফিল্মগুলো যখন ঝকঝকে কালার প্রিন্ট হয়ে ফুটে উঠবে সবার সামনে, তখন? নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের মরিয়া চেষ্টার বিপরীতে যখন নিজের শরীরেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করবে, ঠিক সেই মুহূর্তে?

নিশ্চয়ই এই পৃথিবীর অপমান-গ্লানির চেয়ে কিয়ামাতের দিনের অপমান-লাঞ্ছনা-গ্লানি কোটিগুণ বেশি ভয়ংকর ও চিরস্থায়ী।

মানবসৃষ্ট সিসি টিভিকে ফাঁকি দিতে পারলেও নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাআলার 'সিসি টিভি'-কে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

নিশ্চয়ই প্রত্যেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ অপরাধগুলোর জন্যও জিজ্ঞাসা করা হবে আমাদের। এমনকি এই ফেইসবুকের সামান্য একটি স্ট্যাটাস (কারও মন রক্ষার্থে) কিংবা সামান্য একটি কমেন্ট (নিজের অজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান বিতরণের জন্য) অথবা সামান্য একটি লাইকের (যেটি মহান আল্লাহর বিধানের সরাসরি বিপরীত কিছু সমর্থন করে) জন্যও জবাবদিহি করতে হবে আমাদের! নিশ্চিত থাকুন!

> "আর সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেওয়া হবে। সে সময় তোমরা দেখবে অপরাধীরা নিজেদের জীবন খাতায় যা লেখা আছে সে জন্য ভীত হচ্ছে এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোট-বড়ো এমন কোনো কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তাদের যে যা-কিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করবেন না।"[২৩]

২

তিনটি বিশেষ স্থান ও উম্মুল মুমিনীন-এর কান্না

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে উঠলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[২৩] সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ৪৯

সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আয়িশা! তুমি কেন কাঁদছ?

জবাবে আয়িশা রদিআল্লাহু আনহা বললেন, জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনারা কি কিয়ামাতের দিন আপনাদের পরিবার-পরিজনের কথা স্মরণ রাখবেন?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনটি স্থানে কেউ কাউকে স্মরণ রাখবে না। তা হলো :

১. মীযানের কাছে। সেখানে প্রত্যেকেই নিজের নেকীর ওজন ভারী না হালকা হয়, সেই দিকেই খেয়াল রাখবে।

২. যখন আমলনামা দিয়ে বলা হবে, 'ওহে! নাও তোমার আমলনামা, পড়ে দেখো।' তখন প্রত্যেকেই এ চিন্তায় বিভোর থাকবে যে, তার আমলনামা ডান-হাতে দেওয়া হয়, না পিছনে থেকে বাম-হাতে দেওয়া হয়।

৩. পুলসিরাতের কাছে। যখন তা জাহান্নামের দুই পার্শ্বের ওপর স্থাপন করা হবে।[২৪]

ভয়ংকর এই স্থানগুলোতে নিজের উত্তম আমল ও মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলার দয়া ও ক্ষমাই আমাদের একমাত্র সম্বল। কিছু কি সঞ্চয় করতে পেরেছি আমরা নিজেদের জন্য? সম্বল কিছু রয়েছে কি আমাদের সেই স্থানগুলোর জন্য?

মুবারাক এই মাসে চেষ্টা করব না সহায়-সম্বল বাড়াতে?

প্রস্তুতি তবে শুরু হোক; বিইযনিল্লাহ। আজ, এখন থেকেই!

৩

আমাদের, মুসলমানদের, প্রাত্যহিক জীবনযাপনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের ওপর পরিষ্কার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কুরআনুল কারীমের ৪৯ তম সূরা আল-হুজুরাত-এর কয়েকটি আয়াতে।

১ম নির্দেশ : হে ঈমান গ্রহণকারীগণ! যদি কোনো ফাসেক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে তা হলে তা অনুসন্ধান করে দেখো। এমন যেন না হয় যে, না জেনে-শুনেই তোমরা কোনো গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।

---

[২৪] আবূ দাউদ, ৪৩৭৩

২য় নির্দেশ : মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানি করা হবে।

৩য় নির্দেশ : হে ঈমানদারগণ! পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম।

৪র্থ নির্দেশ : তোমরা একে অপরকে বিদ্রুপ কোরো না। এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর গোনাহের কাজে প্রসিদ্ধ লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালিম।

৫ম নির্দেশ : হে ঈমানদাগণ! বেশি ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো, কারণ কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গোনাহ। দোষ অন্বেষণ কোরো না।

৬ষ্ঠ নির্দেশ : আর তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবাহ কবুলকারী এবং দয়ালু।[২৫]

ওয়াল্লাহি! ওপরের প্রত্যেকটি কুকর্মকে আমাদের সমাজে 'অতি স্বাভাবিক কর্ম' হিসেবেই দেখা হয়। অথচ মহান আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে এই খারাপ কাজগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলেছেন। শুধুমাত্র 'পৈতৃকসূত্রে মুসলিম' হয়েই নিজেদেরকে সর্বেসর্বা ভাবার কোনো যুক্তিই নেই। আমাদেরকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথ আঁকড়ে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা প্রতি মুহূর্তে করে যেতে হবে।

আমরা 'মুসলিম' হয়ে কোনোভাবেই মহান আল্লাহ তাআলাকে কিংবা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধন্য করিনি। বরং দ্বীন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে নিজেদেরকে যাবতীয় জঘন্য বিষয় থেকে (উভয় জীবনের) রক্ষা করার সুযোগ করে নিতে পেরেছি মাত্র।

আল-হামদুলিল্লাহ, সুম্মা আল-হামদুলিল্লাহ!

> "এসব লোক তোমাকে বোঝাতে চায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার উপকার করেছে। তাদের বলো, ইসলাম গ্রহণ করে আমার উপকার করেছ,

[২৫] সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ৬, ১০, ১১, ১২

একথা মনে কোরো না। বরং যদি তোমরা নিজেদের ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তা হলে আল্লাহ তাআলাই তোমাদের উপকার করে চলেছেন। কারণ তিনি তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়েছেন।"[২৬]

পরিবর্তনের যাত্রা শুরু হোক এই মুহূর্ত থেকেই—বিইযনিল্লাহ।

[২৬] সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৭

হৃদয়ে কা'বা

১

একটি ডকুমেন্টারি দেখছিলাম ন্যাশনাল জিওগ্রাফির, 'Inside Mecca' নামের। তিন মহাদেশ থেকে তিনজন মুসলিমের পবিত্র হাজ্জ পালনের জন্য মক্কা মুকাররমায় আসা এবং হাজ্জের আহকামগুলো পালনের ওপর নির্মাণ করা হয়েছিল সেই ডকুমেন্টারি।

ফিদেলমা : ইসলাম ধর্মে পুনঃদীক্ষিত একজন মার্কিন মহিলা সেই ডকুমেন্টারির অন্যতম একটি চরিত্র ছিল। ডকুমেন্টারির এক পর্যায়ে কোনো একটি গেট দিয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করেন তিনি। চোখের সামনে হঠাৎ উদ্ভাসিত হলো বাইতুল্লাহ। পবিত্র কা'বা জীবনের প্রথমবারের মতো দেখতে পেয়ে আবেগ সামলাতে পারলেন না ফিদেলমা। ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। মুখে তালবিয়াহ, আর চোখভর্তি কান্না নিয়ে কা'বা-র দিকে ছুটে গেলেন ফিদেলমা!

দৈনিক ন্যূনতম পাঁচবার যেই কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মুসলমান, আদম আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, রাসূলে আকরাম মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্মৃতি-বিজড়িত যেই স্থান, মহিমান্বিত আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত আদায়ের লক্ষ্যে তৈরি পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রার্থনার স্থান যেই কা'বা, সেই কা'বা-কে নিজ চোখে প্রথমবার দেখার অনুভূতি কেমন হতে পারে—এটা চিন্তা করলেই গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায় আমার।

আমার তাওফীক হয়নি এখনও হাজ্জ করার। আল্লাহ পাকের ঘর কা'বা নিজ চোখে এখনও দেখতে পারিনি। টিভিতে কিংবা কম্পিউটারে দেখে মন ভরে না। তাই অনেকদিন ধরে বিচিত্র একটি 'কাজ' করে আসছি আমি! সম্ভবত ২০০৬ এর দিকে 'গুগল আর্থ' নামের একটি অ্যাপ্লিকেশনের নাম শুনলাম প্রথম। প্রথম যেদিন ইনস্টল করলাম, সেইদিনই প্রেমে পড়ে গেলাম এর। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের সন্ধান পেলাম যেন আমি। শুরু হলো আমার 'ভার্চুয়াল ভ্রমণ'!

'গুগল আর্থ' আসার পর থেকে কয় লক্ষবার যে মক্কায় গিয়েছি, হিসেব নেই। হারাম শরীফের 'থ্রি ডি ভিউ' আসার পরে ভার্চুয়াল ভ্রমণের সংখ্যা আরও বেড়েছে। জাবাল-আন-নূর (হেরা পাহাড়), ইয়েমেনি কিংবা ইরাকি কর্নার, মাকাম-ই-ইবরাহীম থেকে কা'বা-র দিকে তাকাই, আমার রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। কম্পিউটারের মাউস টেনে টেনে নিজেকে হাজরে আসওয়াদ হাতিম কিংবা কা'বা-র দরজার সামনে নিয়ে যাই, আমার বুকের ভেতর জ্বলে ওঠে লক্ষ ওয়াটের বাতি।

মহিমান্বিত আল্লাহ পাকের কাছে আমার প্রার্থনা—তিনি যেন আমাকে পবিত্র হাজ্জ পালনের তাওফিক দেন। আমার নিয়ত যাতে আমি পূর্ণ করতে পারি। ফিদেলমা কিংবা লক্ষ-কোটি সৌভাগ্যবান মুসলমানদের মতো আমিও একদিন নিজ চোখে কা'বা দেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে চাই!

২

২০১৪ সালের অক্টোবর মাসের কথা। বাইতুল্লাহ কা'বা ও হাজ্জের ওপর National Geographic চ্যানেলের বানানো একটি ডকুমেন্টরি দেখে তুমুল আলোড়িত হলাম আমি, এই পাপী বান্দা। ইচ্ছে করছিল—মুহূর্তেই ছুটে চলে যাই বাইতুল্লাহ'র ছায়ায়। সেই রাতেই নিজের মনের গভীর আকুতি, অনুভূতি শব্দবন্দি করে একটি স্ট্যাটাস লিখলাম। স্ট্যাটাসের শেষে অনেকটা এমন ছিল—'বাইতুল্লাহ, কা'বা নিজের চোখে দেখে আমিও কোনো একদিন বোন ফিদেলমার মতো অঝোরে কাঁদতে চাই।'

রাত ১১টার মতো বাজে। ইনবক্সে ম্যাসেজ এল একটি। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভাই নক করে আমার নাম্বার চাইলেন। কথা বলবেন। অপরিচিত মানুষ। নাম্বার দেব কি না, ভাবছিলাম। শেষ পর্যন্ত দিলাম। মিনিট খানেকের মধ্যে দেশের বাইরে থেকে একটি কল এল মোবাইলে। বয়সে আমার চেয়ে বড়ো তিনি। খুব বেশি সময় নিলেন না। সরাসরি যেই কথাটি আমাকে বললেন, তার সারমর্ম মোটামুটি এরকম—'জাভেদ ভাই! আমি আপনাকে অনেক বছর থেকে ফলো করি। আজকে আপনার লেখা স্ট্যাটাসটি পড়লাম।

আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তবে আমি আপনাকে কিছু টাকা হাদিয়া দিতে চাই, যেই টাকা দিয়ে আপনি আগামী বছর (২০১৫ সালে) হাজ্জে যাবেন ইন শা আল্লাহ।'

আমার মনে হচ্ছিল—আমার হৃদপিণ্ডের চলাচল মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। একবার মনে হলো, কেউ বোধহয় দুষ্টুমি করছেন। কিন্তু ভাইয়ের গলায় এমন কিছু ছিল, সেই ধারণাকে মনে জেঁকে বসতে দেয়নি। আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম, আপনার টাকায় হাজ্জে গেলে আমার কি হাজ্জ হবে?

তিনি উত্তর দিলেন, 'জি, হবে। আপনি খবর নিয়ে দেখেন কোনো আলিমের কাছে।'

আমি ফোন কেটে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো পরিচিত ২ জন মুফতির সাথে কথা বললাম। অভিন্ন উত্তর—হ্যাঁ, হবে।

কেউ যদি আমাকে হাজ্জের জন্য অথবা অন্য যে-কোনো কারণে হাদিয়া হিসেবে এতটুকু পরিমাণ টাকা দেন, যেই টাকা আমার কাছে থাকলে হাজ্জ আমার জন্য ফরজ হবে, তবে সেই টাকা ব্যয় করে আমার হাজ্জে যাওয়া ফরজ।

ইনবক্সে নক করার পর সেই ভাই আবার কল করে বললেন—আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেন ভাই। আমি চাই যে, মক্কা ও মদীনাতে আপনি ফাইভ ষ্টার হোটেলে থাকবেন এবং নিশ্চিন্তে ইবাদাত করবেন। আমি যতদূর জানি, এমন প্যাকেজে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা লাগে। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে ৮ লক্ষ টাকা জমা হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

ফোন কেটে দিলেন সেই ভাই। আমি সম্পূর্ণ ঘোরের মধ্যে, সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনকে '১০/১২ মিনিটের কথার ফলাফল' হিসেবে আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার ইনবক্স করে আবার ঘোরের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আগের রাতের কথা নিতান্তই স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। মনের ভেতর সামান্য যে আশার আলো জ্বলছিল, সকালের বাস্তবতার উজ্জ্বল আলোতে সেই সামান্য আলো উবে গেল রীতিমতো। গত রাতের পুরো ঘটনাকে পুরোপুরি অবিশ্বাস্য মনে হলো একপর্যায়ে। আমি দুনিয়ার বাস্তবতার নিরিখে বিচার করে বেমালুম ভুলে গেলাম ঘটনাটি। ভুলে-যাওয়া ঘটনাটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল সপ্তাহ খানেক পর, যেদিন মোবাইলে ম্যাসেজ পেলাম—'আপনার অ্যাকাউন্টে ৮ লক্ষ টাকা জমা হয়েছে!'

সেই ঘোরলাগা রাতে বাসায় ফিরে স্ত্রীকে পুরো ঘটনাটুকু জানালাম, প্রথমবারের মতো। অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হওয়ার খবরও দিলাম। অবিশ্বাস্য চেহারায় পুরো ঘটনা শুনে স্ত্রী

ততোধিক অবিশ্বাস্য গলায় আমাকে জানাল—সে নিজেও আমার সাথে হাজ্জে যেতে চায়, সাথে আমাদের ৫ বছর বয়েসী ছেলেকে নিয়ে!

আমি চুপ করে গেলাম। অসম্ভব বিষয় নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের বাহ্যত কোনো সঞ্চয়ই ছিল না। আসলে স্ত্রীর সাথে কথা বলার পর আমি আরও ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। বেচারি স্বামীর সাথে হাজ্জ করতে চাইছেন, কিন্তু আমার সামর্থ্য নেই তার ইচ্ছে পূরণ করার। পরদিন মায়ের সাথে বসে পুরো বিষয়টি নিয়ে কথা বললাম এবং পুরোপুরি ঘাবড়ে গেলাম। আমার মা কাঁদতে কাঁদতে জানালেন, তিনিও আমার সাথে ২০১৫ সালে হাজ্জে যেতে চাচ্ছেন! ১৯৯০ সালে বাবা মারা যাবার পরে আমার মা কোনোদিন এইভাবে কোনো কিছুর দাবি করেননি আমার কাছে।

মোটামুটি গভীর সমুদ্রে পড়ে গেলাম আমরা পুরো পরিবার। মা ও স্ত্রীকে রেখে কীভাবে যাব, এটা যেমন ভাবছি, একই সাথে এটাও ভাবছি—তাদেরকে নিয়েও-বা যাব কীভাবে! পরিচিতদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম - ৪ জন (আমি, মা, স্ত্রী ও ছেলে) মোটামুটিভাবে হাজ্জে যেতে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আমাদের সম্বল ব্যাংকের ৮ লক্ষ। ৬ লক্ষ টাকার কমতি ছোটোখাটো বিষয় না আমাদের মতো পরিবারের কাছে।

আমরা একসাথে বসলাম সবাই। আমার মায়ের কিছু জমানো টাকা ছিল। বাবা মারা যাবার পর সরকার থেকে এককালীন পাওয়া টাকাটা একটি হালাল ব্যবসাতে বিনিয়োগ করা ছিল। সেখান থেকে সামান্য ২/৩ হাজার টাকা পেতেন তিনি প্রতি মাসে। মা সিদ্ধান্ত নিলেন, এককালীন টাকাটা তুলে দিবেন। তাতে ঘাটতি কিছুটা কমল।

এবার স্ত্রীর পালা। তিনি জানালেন, সংসারের খরচ থেকে অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে কিছু টাকা জমিয়ে ছিলেন তিনি। সেটিও যুক্ত করা হলো আমাদের যৌথ হাজ্জ ফান্ডে। শেষে হাত দিতে হলো স্ত্রীর সামান্য যেই স্বর্ণালংকার ছিল, সেটিতে। তারপরেও প্রায় ২ লক্ষ টাকার ঘাটতি রয়েই গেল।

আমরা ঠিক করলাম, আমরা এখন থেকেই জমানো শুরু করব। এবং অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ এড়িয়ে চলব। যেহেতু হাজ্জের আগে আরও ৫/৬ মাস সময় আছে, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সহজ করে দিয়েছিলেন অনেক কিছু।

এবার সমস্যায় পড়লাম সেই ভাইকে নিয়ে যিনি শুধু আমার জন্য ফাইভ ষ্টার হোটেলে থেকে হাজ্জ করার জন্য ৮ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। একরাতে দুরু-দুরু-বুকে নক করলাম তাকে। কিছুক্ষণ পর কল করলেন তিনি। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম—ভাই! আমি যদি ভিআইপি প্যাকেজে না গিয়ে আপনার দেওয়া টাকার সাথে আমাদের নিজেদের জমানো

টাকা মিলিয়ে আমার সাথে আমার মা, স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে হাজ্জে যাই, আপনার কোনো আপত্তি আছে কি?

ভয়ে ছিলাম, তিনি বিষয়টি কীভাবে নেবেন। কারণ তার সাথে আমার কথা খুব কম সময়ের জন্যই কথা হয়েছিল। আল-হামদুলিল্লাহ, তিনি অত্যন্ত খুশিমনে আমাদের অনুমতি দিলেন। ১ জনের টাকায় যদি ২ জন হাজ্জ করতে পারে, তবে সেটি তো আরও উত্তম।

পরবর্তী ৫/৬ মাসের প্রায় প্রতিটি দিন মনের ভেতর একটা অন্যরকম অনুভূতি কাজ করেছে। সামান্য খরচগুলো থেকেও টাকা জমাতে কার্পণ্য করিনি আমরা। সিএনজির বদলে রিকশা, সফট ড্রিংকসের বদলে পানি, গরুর গোশতের বদলে মাছ, এগুলো সামান্য কিছু উদাহরণ। মক্কায় ৪ বেডের বদলে ৩ বেডের একটি রুম নেওয়ার প্ল্যান করলাম যেখানে ২টি বেড একত্র করে আমরা স্বামী-স্ত্রী-সন্তান ৩ জন থাকব। অন্য বেডে মা। তাতেও কিছু টাকার সাশ্রয় হলো। আবার মা'কে মামা-রা যাবার আগে কিছু টাকা হাদিয়া দেন হাতখরচ হিসেবে। মোদ্দা কথা, প্রতিটি খরচ থেকে কীভাবে কিছু বাঁচিয়ে ঘাটতি পূর্ণ করা যায়, সেই চিন্তাতেই কেটেছে সময়। এবং আল-হামদুলিল্লাহি তাআলা, আমাদের বাকি টাকার ঘাটতি আল্লাহ তাআলা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

২৯শে আগস্ট ২০১৫ সালের রাতে আমরা যখন হাজ্জের সফর শুরু করেছিলাম—সেই দিন, সেই মুহূর্তে 'জাগতিক' হিসেবে আমি ও আমার পরিবার 'পুরোপুরি নিঃস্ব'। টাকাপয়সার ব্যালেন্স আক্ষরিক অর্থে শূন্যের কোঠায় রেখে আমরা বায়তুল্লাহ'র মুসাফির হলাম। কিন্তু আখিরাতের হিসেবে নিজেদেরকে সবচেয়ে বেশি ধনবান, সবচেয়ে পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছিল সেদিন।

আর আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের হাজ্জ কবুল করে থাকেন, তবে তো তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো ফিরে এসেছিলাম দেশে!

আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

পাদটীকা :

১. আমি নিজ-জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ পেলাম—যদি আমার নিয়ত সহীহ হয়, তবে আল্লাহ তাআলা এমন মাধ্যম থেকে আমাকে সাহায্য করবেন, যা অচিন্তনীয়।

"...আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযক দেবেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।"[২৭]

২. এটি ছিল সেই বছরের হাজ্জ, যেবার মাতাফে ক্রেন ভেঙে পড়ে এবং মীনায় পদদলিত হয়ে অসংখ্য হাজি শহীদ হন। খুব কাছ-থেকে-দেখা সেই স্মৃতি নিজের তাকওয়া বাড়াতে এখনও সাহায্য করে।

৩. আমার সেই 'অপরিচিত' ভাই! তিনি হাজ্জে যাবার আগে শুধু একটি কথাই বলেছেন—"দয়া করে আমার জন্য কোনো দুআ করবেন না। এই সম্পূর্ণ বিষয়ের প্রতিদান আমি শুধু মহান আল্লাহর কাছেই চাইব।' তার কথা রেখেছিলাম আমি। মুখ ফুটে যদিও দুআ করিনি, কিন্তু অন্তরের পরিপূর্ণতা ও কৃতজ্ঞতার কথা তো রাব্বে কা'বা সবটুকুই জানেন।

আমার সাথে তার কালেভদ্রে কথা হয়। ২০১৫ সালে ঢাকার একটি নাম্বার থেকে তার কল পাই। তিনি জানান, কদিনের জন্য দেশে এসেছেন। আমি রীতিমতো কাকুতি-মিনতি করি একবার তাকে সামনাসামনি দেখার জন্য, প্রয়োজনে ৫ মিনিটের জন্য। তিনি সরাসরি 'না' বলে দেন। তিনি বলেন, "ভাই! এখান থেকে অনেক উত্তম কোনো জায়গায় আমরা দেখা করব একদিন ইন শা আল্লাহ; হয়তো জান্নাতে।"

আল-হামদুলিল্লাহ, আমার এই ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছে দুনিয়াতেই। এবং অবশ্যই সেটি ঢাকা শহর থেকে অতি উত্তম স্থান ছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শহরে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাসজিদ, মাসজিদ আন-নববিতে! ২০১৬ সালের হাজ্জে।

দুনিয়ার বুকে যদি আর দেখা না হয়, তবে আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ যেন হয় জান্নাতুল ফিরদাউসে—সেই দুআ করি।

৪. সেই প্রথবারের হাজ্জের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা পরবর্তীকালে আমাকে আরও ৩ বার বাইতুল্লাহর মুসাফির হিসেবে কবুল করেছেন। প্রতিবারই মহান আল্লাহ কোনো-না-কোনো মাধ্যম বের করে দিয়েছেন আমাকে। কিছু আল্লাহর বান্দা বিভিন্ন টাইপের সাহায্য (অর্থনৈতিক নয় শুধু) করেছেন। নামগুলো গোপন থাক। তাদের পুরস্কার তো নিজ রবের কাছেই রয়েছে।

৫. কিছু কিছু বিষয় এমন আছে, যেগুলোর পুরস্কার পৌনঃপুনিক হারে বাড়তে থাকে।

[২৭] সূরা তালাক, ৬৫ : ২, ৩

প্রথম হাজ্জের পরে আমার ও আমার পরিবারের 'ইলম ও 'আমলের দিক দিয়ে যদি কোনো উত্তম পরিবর্তন এসে থাকে, তবে সেই অপরিচিত ভাই নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের সমান সাওয়াব পেয়েই যাচ্ছেন। একটি পরিবারের যাবতীয় উত্তম 'আমলের সমান সাওয়াব তিনি পেতেই থাকবেন। চেষ্টা করলেও তাকে ছোঁয়ার সামর্থ্য নেই আমাদের। ইবাদাত-আখলাক-দাওয়াহ, যেদিক দিয়েই আমরা যত চেষ্টা করব তাকে ছোঁয়ার, তিনি তত এগিয়ে যেতে থাকবেন; সুবহানাল্লাহ!

৬. আমার ও আমার পরিবারের মধ্যে এখনও সেই অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করে। এখনও যে-কোনো খরচের থেকে চেষ্টা করি টাকা বাঁচানোর, সেটি যত নগণ্যই হোক না কেন। উদ্দেশ্য একটাই—স্বপরিবারে আবার বাইতুল্লাহ'র মূসাফির হওয়া, বিইযনিল্লাহি তাআলা। পৃথিবীর কোথাও ঘুরতে যাবার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই। শুধু মনে হয়, ওই ঘুরতে যাবার টাকা তো বাইতুল্লাহতে যাবার জন্য জমা করতে পারি আমরা। আল্লাহ তাআলা আমাদের আশা পূর্ণ করুক।

মূল লেখার চেয়ে পাদটীকা বড়ো হয়ে যাচ্ছে। শেষ করব একটি কথা বলে।

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ থেকে দয়া করে নিরাশ হবেন না। নিয়্যত সহীহ রাখুন ও চেষ্টা করতে থাকুন। অকল্পনীয় জায়গা থেকে নুসরাহ পাঠাবেন আল্লাহ তাআলা।

২০১৭ সালের হাজ্জে গিয়েছেন, এমন এক ভাইকে আমি চিনি যাকে ঠিক আমার সেই অপরিচিত ভাইয়ের মতো অন্য কিছু ভাই সাহায্য করেছেন বাইতুল্লাহ'র মূসাফির হতে। শুধুই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে।

অবাক হচ্ছেন?

আমি এমন এক বোনের সম্পর্কে জানি, যিনি একজন ভিক্ষুককে হাজ্জে পাঠিয়েছেন। বৃদ্ধ ভিক্ষুক চাচা গুলশান ২ নাম্বার মোড়ে ভিক্ষা করছিলেন। সেই বোন গাড়ি থামিয়ে বৃদ্ধ ভিক্ষুক ভাইটিকে বলেন—"চাচা, আপনি হাজ্জে যাবেন? আপনার চেহারা অবিকল আমার মৃত বাবার মতো। আপনি রাজি থাকলে আপনাকে আমি এবার হাজ্জে পাঠাতে চাই।"

চিন্তা করতে পারেন সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক চাচার রিযক সম্পর্কে? ভাবতে পারছেন তার মুখে খুশির আতিশয্যের কথা? কিংবা সফরের উদ্দেশ্যে বিদায় দেবার সময় সেই বাবাহারা বোনের তৃপ্তির কথা?

আল্লাহু আকবার, ফালিল্লাহিল হামদ!

বাইতুল্লাহ'র মুসাফির

১

সাল ২০১৫, হাজ্জের সফরের কথা।

আসরের সালাতের সময়। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বাইতুল্লাহ কা'বার বাইরে পিচঢালা রাস্তায় সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছি। আমার পাশে ইয়েমেনি এক যুবক, জিবুতির এক বৃদ্ধ ও ইন্দোনেশিয়ার এক তরুণ। জিবুতির বৃদ্ধ নিজের জায়নামাজ আড়াআড়ি করে বিছিয়ে দিয়েছেন আমাদের জন্য। আমরা চারজন সেই আড়াআড়ি জায়নামাজের ওপর পা রেখে সালাত আদায় করছি। স্বাভাবিকভাবেই সাজদা দিতে হচ্ছে পিচের রাস্তার ওপরে।

তৃতীয় রাকআতের সময় পাশ থেকে হঠাৎ একটি মোটা, পশমি জায়নামাজ আড়াআড়ি এসে আমাদের সাজদার জায়গাটুকু ঢেকে দিল। তপ্ত রাস্তার ওপর দুই রাকআতের সাজদা দেওয়ার পর পশমি জায়নামাজের ওপর বাকি দুই রাকআতের সাজদা দিয়ে সালাত শেষ করলাম। সালাম ফিরিয়ে মোটা, পশমি জায়নামাজের মালিক ভাইকে দেখলাম আমরা চারজন। কৃষ্ণাঙ্গ সেই ভাই নিজে পিচের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বাকি দুই রাকআত সালাত আদায় করছেন। ইচ্ছে করলেই নিজের জায়নামাজের শতভাগ ব্যবহার করতে পারতেন তিনি। আমাদের চারজনের আরামের জন্য আড়াআড়ি করে বিছিয়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে গেছেন পিচগলা রাস্তায়!

ইন্দোনেশিয়ার তরুণ ভাইটি তাড়াতাড়ি করে জায়নামাজটি ঘুরিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ ভাইয়ের সামনে রাখলেন। সালাত শেষে ছোটো অথচ অর্থবহ কাজটির জন্য ধন্যবাদ জানালাম তাকে

আমরা।

কৃষ্ণাঙ্গ ভাইটি সুদানের বাসিন্দা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, 'না ভাইয়েরা। আপনাদের আরামের চেয়ে নিজের একটি বিষয় টের পাওয়া জরুরি ছিল। হঠাৎ মাথায় আসায় সুযোগটি নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পুরোপুরি টের পেতে দিলেন কোথায়!'

'তো কী অনুভব করতে চেয়েছিলেন আপনি?' – আমাদের প্রশ্ন।

সুদানের ভাইটি নীচু গলায় বললেন, 'বিলাল ইবনু রাবাহ রদিআল্লাহু আনহু-এর কষ্টের ছিটেফোঁটা। কৃষ্ণাঙ্গ সেই মানুষটিকে কুরাইশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফ আমাদের আশেপাশের কোনো স্থানেই উত্তপ্ত মরুভূমির মাঝে বুকে পাথর চাপিয়ে শুইয়ে রাখত দিনভর। আর সীমাহীন নির্যাতন করে দ্বীন ইসলামের থেকে বের করার চক্রান্ত করত। 'আমাদের পূর্বপুরুষ' হিসেবে তাঁর সেই কষ্ট ১৪০০ বছর পরে নিজের শরীর দিয়ে অনুভব করার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চেষ্টা করেছিলাম মাত্র!'

ভাতৃত্বের বন্ধন যখন একই সুতোয় বাঁধা, এক ভাইয়ের মনের ভাব বাকি ভাইদের মনের ভেতর তোলপাড় সৃষ্টি না করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।

২

গত বছরের (২০১৭) হাজ্জের সফরের কথা।

ঈশার সালাত শেষ করে জানাযার সালাত আদায় করলাম আমি আর আমার শ্যালক। তারপর সুন্নাহ পড়ে হারাম থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তখনই হঠাৎ মাইকে কিছু একটা ঘোষণা দেওয়া হলো। মন না থাকায় ঠিক শুনতে পাইনি। প্রথমে ভেবেছিলাম, আবারও জানাযার সালাত মনে হয়। লাশের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে কিংবা পরে হঠাৎ লাশ এলে আবার জানাযার সালাত হয়। তাই প্রথমে জানাযার সালাত ভেবেছিলাম।

গেটের দিকে একটু আগাতেই সালাত শুরু হলো এবং ইমাম সশব্দে সূরা ফাতিহা পড়া শুরু করলেন। বিদ্যুত গতিতে মাথায় কাজ করল—এটি নিশ্চয়ই চন্দ্রগ্রহণের সালাত। কারণ ইমাম সশব্দে কিরাত পড়বেন এমন অন্য কোনো সালাত ওই সময়ে থাকতে পারে না। শ্যালকের হাত টান দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে গেলাম। আমার সালাতের নিয়ম জানা ছিল, আল-হামদুলিল্লাহ। কিন্তু তাকে পুরো বলার সুযোগ পাইনি। শুধু বললাম, চন্দ্রগ্রহণের সালাত, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

ইমাম ছিলেন শাইখ আবদুল্লাহ আওয়াদ জুহানি হাফিযাহুল্লাহ। খুব সম্ভবত তিনি প্রথম

রাকআতে সুরা আম্বিয়া ও দ্বিতীয় রাকআতে সুরা ক্বা-ফ পড়েছিলেন। প্রথম রুকুর পরে ভুল করে সামনের কয়েকজন সাজদার দিকে ছুটেছিলেন যদিও। পরে সূরা ফাতিহা পড়তে দেখে আবার হাত বেঁধে সালাত চালিয়ে গেলেন। সুদীর্ঘ রুকূ ও সাজদা-সহ দুই রাকআত সালাত আদায় করতে আমাদের প্রায় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের মতো লেগেছিল। ধীরস্থির তিলাওয়াত, খুশু অফুরান। বেশ কষ্ট হলেও অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছিল।

পাশের এই ভাই প্রথম রাকআতের দৈর্ঘ্য দেখে দ্বিতীয় রাকআত আর ইমামের সাথে কন্টিনিউ করেননি। দ্বিতীয় রাকআত নিজের মতো করে শেষ করে ফেললেন একাকী। সামনের একজন প্রথম রাকআত দাঁড়িয়ে পড়লেও দ্বিতীয় রাকআত বসে আদায় করলেন। আরও ২/৩ জন দ্বিতীয় রাকআতে সালাত ভেঙেই ফেললেন। এই সালাত বয়স্কদের জন্য কিছুটা কষ্টকর, এটি সত্য।

যাই হোক, সালাত শেষে খুতবা শুরু হলো। সবচেয়ে মজা পেয়েছি, সামনের কাতারের দুই ভাই সালাম ফেরানোর পরে নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করলেন। মনের ভাব অনেকটা এরকম—কী সালাত পড়লাম এটা! এত লম্বা! দুই রুকূ প্রতি রাকআতে। বিস্ময়ের হাসি থামেই না তাদের। হাসির বেগ থামাতে বেশ কষ্ট হয়েছিল তাদের।

সালাত শেষে হারামের আঙিনায় যখন দাঁড়ালাম, তখনও গ্রহণ শেষ হয়নি। কিছু মানুষ বলছিলেন, চাঁদ ছিঁড়ে পড়ে গেছে। আরও অনেকে অদ্ভুত কারণ বলছিলেন পরস্পর। আমাদের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। তারপরেও জীবনে প্রথম সালাতুল খুসূফ বা গ্রহণের সালাত পড়ার তৃপ্তি টের পাচ্ছিলাম মনে। তার ওপরে আবার বাইতুল্লাহিল হারামে। আল-হামদুলিল্লাহ।

আরেকটি মুবারাক বিষয় ছিল। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত মক্কা ও মদীনায় নিয়মিত পড়া হয় (আমাদের দেশ-সহ পৃথিবীর আরও অসংখ্য জায়গায়ও পড়া হয়)। কিন্তু সময়ের ভিন্নতার কারণে অনেকেই পড়তে পারেন না। সেই রাতের গ্রহণের সালাত ঠিক ঈশার সালাতের পরপর হওয়াতে মাসজিদুল হারামের প্রায় অধিকাংশ মানুষ শরীক হতে পেরেছিলেন। একটি হারিয়ে-যাওয়া সুন্নাহ'র বিষয়ে জেনেছেন তারা। হয়তো আমৃত্যু নাতি-নাতনিদের কাছে গল্পও করে যাবেন এ ঘটনার—"জানিস কী হয়েছিল? মাত্র বের হচ্ছিলাম হারাম থেকে। হঠাৎ শুনি..."

শেষ-কথা : আমাদের এক ভাই এই সালাত কীসের সালাত, সেটি বুঝেননি। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি মনে মনে নিয়ত করলেন— ইমাম সাহেবের যেই নিয়ত, আমারও একই নিয়ত, 'আল্লাহু আকবার'।

৩

মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ্। হাজ্জের সফরের কথা।

মাসজিদে নববিতে হাজিদের রীতিমতো উপচে-পড়া-ভিড়। এর মধ্যে নিজে দূর থেকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজাহ যিয়ারাতের সুযোগ পেলেও ৬ বছর বয়সী পুত্র আবদুল্লাহ আরহামকে নিয়ে যিয়ারাতের সুযোগ মেলেনি। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে একবার কাঁধে নিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। প্রায় ৯/১০ সারি দূর থেকে কোনোরকমে আরহামকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজাহ দেখালাম। তাতে বেচারার শিশুসুলভ চপলতা বাড়ল বৈকি, কমল না।

প্রতিদিন সকাল থেকেই মন খারাপ করে আরহাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজাহ'র একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দিতে চায় সে। ঠিক একইভাবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 'দুই ফ্রেন্ডস' (আরহামের ভাষায়) আবূ বকর সিদ্দীক এবং উমার ইবনুল খাত্তাব রদিআল্লাহু তাআলা আনহুম-এর কবরের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে সালাম জানাতেই হবে তার। যতই ভিড়ের কথা বলি, ভিড় দেখাই—ততই চোখে পানি চলে আসে ছেলের।

সাধারণত বাবুস সালাম (১ নং গেট) দিয়ে ঢুকে রওজাহ যিয়ারাত করে বাবুল বাক্বী (৪১ নং গেট) দিয়ে বের হয়ে আসতে হয় সবার। বাবুল বাক্বী ঘেঁষেই রওজাহ। সুনিয়ন্ত্রিত একমুখী চলাচল। ছেলের মন ভুলাতে প্রতিদিন আসরের সালাতের আগে বাবুল বাক্বী'র বাইরে তাকে নিয়ে বসতাম। দূর থেকে রওজাহ'র সবুজ প্রাচীর দেখাতাম আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রাণপ্রিয় দুই সাহাবির গল্প শুনাতাম।

প্রতি ওয়াক্ত আযানের কিছু সময় পরেই যিয়ারাত বন্ধ করে দেয় পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবী ভাইরা। সালাত শেষ হবার পরে আবার লাইন ধরে যিয়ারাত শুরু করেন সবাই। মাঝের এই সময়টা আরহামের জন্য সুবর্ণ সময়। বাবুল বাক্বী'র বাহির থেকে এই সময়টুকুতে পরিষ্কার দেখা যায় রওজাহ। গেটের ঠিক বাহিরেই লাল-সাদা প্লাষ্টিকের রশি দিয়ে আটকে দেওয়া হয় যাতে বিপরীত দিক থেকে (বাবুল বাক্বী'র দিক থেকে) কেউ ঢুকতে না পারেন।

একদিন আসরের আযানের পরে আরহামকে পাশে বসিয়ে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত পড়ছি। সালাম ফিরিয়ে পাশে তাকিয়ে দেখি—আরহাম পাশে নেই! দূরে বাবুল বাক্বী'র বাইরে সেই লাল-সাদা রশি ধরে দাঁড়িয়ে আছে ছেলে আমার। চোখ তার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজাহ মুবারকের দিকে স্থির। ডাকার চেষ্টা করে বুঝলাম শুনতে পাবে না। উঠে ওকে নিয়ে আসব—ভাবতে ভাবতেই দেখি দুই পুলিশ

ভাই কী জানি বলছে ওকে। আমি কাছে যেতে যেতেই দেখি আরহাম তাদের একজনের কোলে চড়ে বসেছে। আমি অবাক হয়ে ইশারায় বললাম তাদের—আমি ওর বাবা।

প্রবল বিস্ময় নিয়ে দেখলাম, লাল-সাদা প্লাষ্টিকের রশি পার হয়ে সেই পুলিশ ভাই আরহামকে কোলে নিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো দিক দিয়ে রাওজাহর দিকে হেঁটে চললেন। বাকি পুলিশ ভাইটি আমাকে ইশারা করলেন পিছু নিতে। সুবহানাল্লাহ! আরহামকে নিয়ে সোজা রাওজাহ'র সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন সেই সুহৃদয় পুলিশ ভাই। পাশ থেকে দুইজন হাজিকে তুলে সামনে পাঠিয়েও দিলেন তিনি, যাতে আরহাম আরাম করে দাঁড়াতে পারে। আরহামের শিশুমনের ব্যকুলতা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বোধকরি। হতভম্ব আমাকেও ডেকে পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি। আল্লাহু আকবার!

আমার চোখে পানি চলে এল নিমিষেই। এতটা কাছে, এতটা মনোযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজাহ যিয়ারাতের সৌভাগ্য হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। আল্লাহ তাআলা সেই সুযোগটিও করে দিলেন আমাদের বাপ-বেটাকে; একসাথে, এত কাছ থেকে, কোনো ভিড়-ঝঞ্জাট ছাড়া! অশ্রুসজল চোখে দুজনে একসাথে সালাম জানালাম সর্বোত্তম মানুষকে—সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলকে, তাঁর সুপ্রিয় দুই বন্ধুকে,

“আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আসসালামু আলাইকা ইয়া খলীফাতু রাসূলিল্লাহ আবূ বকর আস-সিদ্দীক রদিআল্লাহু আনহু।

আসসালামু আলাইকা ইয়া আমিরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব রদিআল্লাহু আনহু।”

আত্মঘাতী অবহেলা

১

শেষ বিকেলের নরম আলোয় বারান্দায় বসে রয়েছেন বাশার সাহেব। এই সময়টাতে বিছানায় শুয়ে থাকতেই বেশি ভালো লাগে তার। তারপরেও অতি আগ্রহ নিয়ে বারান্দায় বসে আছেন তিনি। বাশার সাহেবের স্ত্রী গত হয়েছেন আজ ৩ বছর ৮ মাস ২৫ দিন। একমাত্র ছেলে সোহেল বিয়ে করে আলাদা সংসার শুরু করার ১ মাস ৩ দিনের মাথায় তার স্ত্রী মারা যান। এই বুড়ো বয়সে কোনো কিছুই তেমন মনে থাকে না। শুধু দিন-তারিখের হিসেব খুব পরিষ্কার মনে থাকে।

বাশার সাহেব বারান্দায় বসে আছেন তার একমাত্র ছেলে সোহেলের জন্য। আজ মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার। প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার সময় সোহেল দেখা করতে আসে। আধা ঘণ্টার মতো থাকে, তারপর চলে যায়। পুরো মাসে এই একবারই প্রিয় সন্তানকে দেখার ভাগ্য হয় তার।

প্রতিবার সোহেল দেখা করতে আসার আগে অনেক কিছু বলবেন বলে ঠিক করে রাখেন বাশার সাহেব। কিন্তু কোনো এক কারণে কিছু বলা হয়ে ওঠে না। বিক্ষিপ্ত কথাবার্তায় সময় কেটে যায়। কোনো বার হয়তো কোনো কথাও হয় না। সোহেল নিজেও যাবার জন্য উশখুশ করতে থাকে। ছেলেকে কষ্ট দিতে চান না তিনি। নিজ থেকেই চলে যেতে বলেন তাকে। বারান্দা থেকে গেট দেখা যায়। গেট পর্যন্ত ছেলের দ্রুত হেঁটে যাওয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন তিনি। সময় মানুষকে অনেক পাল্টে দেয়, 'ছেলে নয়; হয়তো আমিই অনেক পাল্টে গেছি'—ভাবেন তিনি।

ঠিক পাঁচটা দশ মিনিটে সোহেল গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। গেট থেকে হেঁটে আসতে ছেলের ৪ মিনিট ২০ সেকেন্ড লাগে। অথচ একই পথ যাবার সময়ে ২ মিনিট ২৫ সেকেন্ডে—সব মুখস্ত বাশার সাহেবের। দূরের ছোটো আকার হাঁটতে হাঁটতে একসময় বড়ো হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। সোহেলের ছোটো থেকে বড়ো হওয়ার মতো মনে অনেকটা।

যথারীতি পাশে রাখা বেতের চেয়ারে এসে বসেছে সোহেল। খুব ক্লান্ত লাগছে তাকে। বাশার সাহেব একবার জিজ্ঞেস করতে চাইলেন শরীর খারাপ কি না। কী মনে করবে ছেলে, এটা ভেবে বলা হলো না।

গেটের পশ্চিম পাশের শিমুল গাছটায় ফুল ফুটেছে। নিরবতা ভাঙতে বাশার সাহেব হঠাৎ কথা বলে উঠলেন,

- ওই লাল ফুলটার নাম জানো?

- শিমুল।

বাশার সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন,

- লাল ফুলটার একটা নাম আছে, বলতে পারবে নাম?

- জানব না কেন? শিমুল।

কেমন জানি ধমক দিয়ে উঠল মনে হলো সোহেল। বাশার সাহেব দ্বীর্ঘশ্বাস ফেললেন,

- এই গাছের ফুলের নাম কী বলো তো দেখি?

- অদ্ভুত তো! তুমি শুনতে পাচ্ছ না? এই নিয়ে তিনবার বললাম, শিমুল নাম এই ফুলের। তোমার সমস্যা কী বাবা?

এইবার রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠল সোহেল।

বাশার সাহেবের চেহারায় বিস্ময় কিংবা কষ্টের কোনো ছাপ পড়ল না। শুধু বাম-হাতে-ধরে-থাকা পুরোনো ডায়ারিটি ছেলের হাতে দিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'এই পৃষ্ঠার লেখাটা পড়।'

কিছুটা অপ্রস্তুত হলো সোহেল। এই অসময়ে ডায়ারি পড়তে হবে কেন তাকে? কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল সে। তার বাবার পড়তে দেওয়া সেই পৃষ্ঠায় সোহেলের ছোটোবেলার একটি ছবি যত্ন-করে-লাগানো; ওই শিমুল গাছটার নিচে তোলা ছবি!

এক নিমেষে প্রচণ্ড অপরাধ বোধ জেঁকে বসল সোহেলকে। ছবির নিচে তার বাবার

গোটা-গোটা হাতে কয়েকটি লাইন লেখা।

"আজ আমার সোহেল একটা অদ্ভুত খেলা খেলল। আমাকে একটানা ৩১ বার জিজ্ঞেস করে গেল একটি প্রশ্ন। আধো আধো বোলে ঘুরে-ফিরেই একটিমাত্র প্রশ্ন—'বাবা! ওই লাল ফুলটার নাম কী?' আমি প্রতিবার ছেলেকে যত্ন নিয়ে ফুলের নাম বলেছি। নাম বললেই গুটিগুটি পায়ে দৌড়ে গেটের দিকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে আবার সেই এক প্রশ্ন। নিজের সন্তানের সামান্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়াতেও যে এমন তীব্র আনন্দ লুকিয়ে আছে, জানা ছিল না আমার। সুরমা আমার আর ছেলের কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে খুন। ৩২ বারের সময় গিয়ে আর জিজ্ঞেস করল না। পরে আলমারি থেকে ক্যামেরাটি বের করে ছেলেকে তার প্রশ্নের 'শিমুল' গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে ছবিটি তুললাম। খুব ভয়ে ছিলাম, ছবিটি উঠবে কি না। ফিল্মের ৩৬টি ছবি ততক্ষণে তোলা শেষ। কপাল ভালো আমাদের বাপ-বেটা'র। ৩৭তম ছবি হিসেবে সোহেলের ছবি উঠল। পুরো ফিল্মের সবচেয়ে দুর্দান্ত ছবি!"

ঝাপসা-চোখে ডায়ারি থেকে মাথা তুলে দূরের শিমুল গাছের দিকে তাকাল সোহেল। চোখের পানিতে শিমুলের লাল আগুন রঙ নিভে যাচ্ছে যেন! অনেকদিন পরে সোহেল একটা অস্বাভাবিক কাজ করে বসল। ছোটো শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠে পাশে-বসা বাবার কোলে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ল!

বাশার সাহেবও কেঁদে চলেছেন, তবে নিঃশব্দে।[২৮]

২

পশ্চিমা দেশগুলোতে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে বাবা-মায়ের সাথে সন্তানদের সম্পর্ক হালকা হতে শুরু করে। বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়টি সন্তানদের "করণীয়" বিষয়ের অনেক বাইরে থাকে। অধিকাংশ কাফির দেশেই আপনি এই অবস্থা দেখতে পাবেন। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ১৮ বছর বয়সের পরে সন্তানরা চাইলে বাবা-মা থেকে আলাদা থাকতে পারবে। মাথা কুটে মরলেও বাবা-মা সন্তানদের কাছ থেকে কিছুই পাবে না, যদি সন্তান নিজেকে আলাদা রাখতে চায় এবং কোনো দায়িত্ব পালন না করতে চায়। এমনকি ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়ালেও রায় ১৮ বছরের বেশি সন্তানের পক্ষে যাবে।

আল্লাহ তাআলার পরে যাদের দয়া-মমতা-ভালোবাসা আমাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে

[২৮] বিদেশী গল্প অবলম্বনে

সাহায্য করেছে, তাঁরা আমাদের মা ও বাবা। গর্ভধারণ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মা কিংবা বাবার ত্যাগের বিষয় কোনো মুসলিম অস্বীকার করতে পারবে না। কুরআনুল কারীমের সূরা আল-ইসরা'র ২৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত কোরো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।"

লক্ষ করুন, আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার বিষয়ে আদেশ করার পরপরেই আমাদেরকে বাবা-মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন। এর মাঝে অন্য কোনো আদেশ নেই! বাবা-মায়ের সাথে উত্তম ব্যবহারের বিষয়ে মহান আল্লাহর আদেশের গুরুত্ব কতটুকু—এটি কি বুঝতে পারছি আমরা?

একই আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তাদের (বাবা-মা) মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বোলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না এবং তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা বলো।"

অর্থ্যাৎ, তাদের উভয়ের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, খেয়াল রাখা এবং প্রাসঙ্গিক যাবতীয় দায়িত্ব পালন আমাদের জন্য ফরজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসগুলোর মাধ্যমেও এই বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিমদের মধ্যেও বাবা-মায়ের অবাধ্যতা, তাদের সাথে নির্মম আচরণ করার ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। "সন্তানের হাতে মা-বাবা খুন"—এমন সংবাদও প্রায়শই চোখে পড়ে আমাদের; নাস্তাগফিরুল্লাহাল আযীম!

আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস থেকে জানা যায়, কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দাসী যখন তার মনিবকে প্রসব করবে।"[২৯]

ইবনু হাজার আল-আসকালানি রহিমাহুল্লাহ তাঁর রচিত সহীহ বুখারির বিখ্যাত ব্যাখ্যা 'ফাতহুল বারি'তে এই অংশের ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামাতের নিদর্শনের এই অংশের (দাসী যখন তার মনিবকে প্রসব করবে) মাধ্যমে এটি বোঝানো হয়েছে যে, কিয়ামাতের নিকটবর্তী এমন এক সময় আসবে যখন মায়ের সাথে সন্তানের অসদাচরণ দেখে মনে হবে সন্তান হলো মনিব, আর মা হলো তার দাসী। ইবনু হাজার এই ব্যাখ্যাটিকে 'আম' হিসেবে বর্ণনা করেছেন (যদিও অন্যান্য প্রসিদ্ধ আলিমগণ এই অংশের ভিন্ন ব্যাখ্যাও

[২৯] বুখারি, ৪৩; মুসলিম, ৫

দিয়েছেন)।

হে আমার ভাই-বোনেরা! আমাদের উচিত, সময় নিয়ে বাবা মায়ের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে চিন্তা করা। নিজেদের কাছে নিজেদের যাচাই করা উচিত—মহান আল্লাহ আমাদের জন্য যেই বিষয় ফরজ করেছেন, সেই বিষয়ে আমরা কতটুকু আন্তরিক ও যত্নবান। যদি কোনো অবহেলা করে থাকি আমরা, তবে আজ-এখন থেকেই তাওবাহ করি আল্লাহর কাছে, তাদের কাছে ক্ষমা চাই এবং তাদের বিষয়ে সর্বাত্মক যত্নবান হই।

আর ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে তাদের সাথে আচরণ করি এবং আল্লাহ তাআলার শেখানো দুআর মাধ্যমেই তাদের জন্য দুআ করি,

> "হে পালনকর্তা! তাঁদের উভয়ের প্রতি আপনি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"[৩০]

[৩০] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৪

সম্মান সমীকরণ

১

আজ থেকে প্রায় ৩৯০০ বছর আগের কথা।

জনমানবহীন ধু-ধু প্রান্তরে এক নারী ও তার দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তান প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর। শিশু-সন্তানের তৃষ্ণার কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে মা'র। নির্জন এই উপত্যকায় খুব সম্ভবত কোনো সাহায্য পাবেন না—এটি জেনেও আশা ছাড়লেন না তিনি। মহান আল্লাহর ওপর যে তার স্থির বিশ্বাস! আশেপাশের পাহাড়গুলোর ওপরে উঠে দূরে সাহায্যের খোঁজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

আশেপাশের পাহাড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে কাছেরটির নাম ছিল সাফা। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত মা অনেক কষ্টে সাফা পাহাড়ে চড়লেন। দিগন্তজোড়া শূন্যতা হাহাকার সৃষ্টি করল তার মনে। উপত্যকার ঠিক উল্টো দিকে মারওয়া নামের পাহাড়ের দিকে ছুটলেন তিনি। নাহ, দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত সব ফাঁকা।

পাহাড়ের ওপর থেকে বালিতে-রেখে-আসা শিশু-সন্তানকে দেখতে পেলেও দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন না সন্তানকে। উপত্যকার মাঝামাঝি পৌঁছালে পরিশ্রান্ত তিনি তার জামা টেনে ধরে দ্রুত চললেন।

শিশু-সন্তান একটু পানীয়ের অভাবে ছটফট করছে আর কাঁদছে। মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি তাঁর একমাত্র সন্তান। দিশেহারা মা মহান আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা রেখে আবার দৌড়ে চললেন সাফা পাহাড়ের দিকে। সেখান থেকে মারওয়া। আবার সাফা, আবার

মারওয়া। এ ভাবেই দু-পাহাড়ের মাঝে সাত বার প্রদক্ষিণ করলেন তিনি।

দুই পাহাড়ে ছোটাছুটি করে ক্লান্ত, নিরাশ, তৃষ্ণার্ত মা হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন যেন। সর্বশক্তি দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "শুনুন। যদি সম্ভব হয়, দয়া করে সাহায্য করুন আমাকে।"

বালিতে-শুইয়ে-রাখা সন্তানের দিকে চোখ পড়তেই বিস্ময়ে জমে গেলেন তিনি। তার শিশু-সন্তানের খুব কাছেই এক জন মানুষকে দেখতে পেলেন যেন। মানুষটি (জিবরীল আলাইহিস সালাম) পায়ের গোড়ালি দিয়ে বালুতে আঘাত করলেন। মুহূর্তেই সেখান থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে লাগল। ধু-ধু মরুভূমির বুকে জন্ম নিল মহান আল্লাহর নিদর্শন, একটি কূপ—জমজম।[৩১]

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিক।

পাঠকবৃন্দ! ৩৯০০ বছর আগে আল্লাহ তাআলার প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখা মমতাময়ী 'এক নারী'-র দুটি পাহাড়ে ক্রমাগত ৭ বার ছুটে চলার ঘটনাকে 'চিরস্থায়ী নিদর্শন' করে দিলেন আল্লাহ তাআলা। আজ পর্যন্ত হাজার কোটি নারী-পুরুষ শুধু মহান আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সেই মমতাময়ী মায়ের অটল বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের নিদর্শনকে পবিত্র হাজ্জ ও উমরাহতে অনুকরণ করে আসছেন।

সুবহানাল্লাহিল আযীম।

২

বাবুল সাহেব (ছদ্ম নাম) আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী।

বেশ হাসিখুশি প্রাণবন্ত এই মানুষটি গত কিছুদিন ধরে কেমন যেন ঝিম মেরে আছেন। বেশ কয়বার জিজ্ঞেস করেছিলাম—মন খারাপ কেন? কোনো উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ায় আমিও বিব্রত করিনি তাকে। আজকে সকালে রুমে এসেছিলেন এক ফাঁকে। কথায় কথায় তার চিন্তার বিষয়টি জানতে পারলাম।

ভদ্রলোকের দুই সন্তান; দুটোই মেয়ে। স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, মাস খানেক পরে ডেলিভারি ডেট। গত সপ্তাহে ডাক্তার জানিয়েছেন, অনাগত শিশুটিও মেয়ে। খুব আশা করেছিলেন একটি ছেলের জন্য। আশা পূরণ না হওয়ায় ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন তিনি। একান্নবর্তী পরিবারের বড়ো ছেলে বাবুল সাহেব। তার মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই একটি ছেলে

[৩১] বুখারি, ৫৮৪

সন্তানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। সংসারের 'প্রদীপ' জ্বালানোর জন্য হলেও একটি ছেলের দরকার—তার বাবা-মায়ের অনুযোগ! আমাদের সমাজব্যবস্থাও 'পরপর তিনটি' মেয়ে সন্তানকে একটু অন্য চোখে দেখে। সব মিলিয়ে মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত তিনি।

মানুষজনকে মানসিকভাবে সাহায্য করার খুব বেশি অভিজ্ঞতা নেই আমার। তারপরেও বাবুল সাহেবকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তাকে আমি মূলত দুটি পয়েন্টে বোঝানোর চেষ্টা করলাম—

১. 'সংসারের প্রদীপ' জ্বালানোর জন্য হলেও একটি ছেলের দরকার, তার বাবা-মায়ের এই কথাটির কোনো যুক্তি নেই। আমাদের রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তিন পুত্র অতি শৈশবে মারা যান। তাঁর বংশের প্রদীপ তাঁর চার কন্যার মাধ্যমেই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে।

২ তিনটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করলাম তার জন্য। বাকি বিবেচনার ভারটুকুও ছেড়ে দিলাম তার ওপর।

(ক) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার দুজন কন্যা সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি) করে, শেষ বিচারের দিন তার সাথে আমি এইভাবে (রাসূল তাঁর দুই হাতের আঙুল একসাথে করে দেখান) একসাথে থাকব।"[৩২]

(খ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান হবে যাদের সে প্রতিপালন করবে, শিক্ষা দেবে এবং তাদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করবে, তার এবং জাহান্নামের আগুনের মাঝখানে একটি শক্ত প্রতিরক্ষক থাকবে।"[৩৩]

(গ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল, অতঃপর সে তাকে (কন্যাকে) কষ্টও দেয়নি, তার ওপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্রসন্তানকে প্রাধান্য দেয়নি, তা হলে ওই কন্যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।"[৩৪]

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে এক পর্যায়ে উঠলেন বাবুল সাহেব। রুম থেকে বের হবার আগে মনে হলো অনেক কিছুই বলতে চাইলেন, কেন জানি পারলেন না কিছু

[৩২] মুসলিম, ২৬৩১
[৩৩] ইবনু মাজাহ, ৩৬৬৯
[৩৪] আহমাদ, ২২৩

বলতে। তবে তার চোখের জলে কৃতজ্ঞতার যে ছায়া দেখতে পেয়েছি, সেটির মূল্য আমার জানা নেই। এক ফোঁটা চোখের জলে কতটুকু কৃতজ্ঞতা লুকিয়ে থাকতে পারে, আমার চেয়ে ভালো সেটি এই মুহূর্তে কেই-বা জানে!

****

তবু অজ্ঞানমনস্ক, তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির ভারবাহী, দুর্গতিশীল প্রজন্ম বলেই যাবে, "ইসলাম মানেই নারীর অসম্মান, অবমাননা আর অপমান।"

কুরআনের ছায়াতলে

১

বদরের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করা হয়েছে প্রায় ৭০ জন কাফিরকে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের আদেশ করলেন, "বন্দিদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।"

আবূ আযীয ইবনু উমাইর (মুসআব ইবনু উমাইর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাই) যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক ছিলেন। তিনি বলতেন, "যখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে যুদ্ধবন্দিদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার আদেশ দেন, তারপর থেকে তাঁরা (সাহাবিরা) আমাদের রুটি খেতে দিতেন; অথচ তাঁরা নিজেরা সামান্য খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন! তাঁদের হাতে আসা প্রত্যেকটি রুটির টুকরো আমাদের দেওয়া হতো খাদ্য হিসেবে। আমি বিব্রত বোধ করতে শুরু করলাম একসময়। আমি রুটি তাঁদের কাছে ফেরত পাঠালেও তাঁরা তা স্পর্শ না করেই আবার ফেরত পাঠাতেন আমাদের খাবার জন্য!"[৩৫]

বলা বাহুল্য, রুটি সেই সময়ে খেজুর থেকে উত্তম খাদ্য হিসেব সমাদৃত ছিল। ওপরন্তু আবূ আযীয ইবনু উমাইর কোনো সাধারণ কাফির শত্রু ছিলেন না। বরং নাযর বিন হারিস বন্দি হওয়ার পরে তিনিই কাফির বাহিনীর মূল পতাকা বহন করেছেন বদরের যুদ্ধে।

আরেক যুদ্ধবন্দি আবুল আস ইবনু রাবীআ থেকেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

[৩৫] তাবারানি, আল-মুজামুস সগীর, ৪০৯

আরেক বন্দি আল ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা বলতেন, "মুসলিমরা পায়ে হেঁটে চলতেন। পক্ষান্তরে আমাদেরকে তাঁদেরই বাহনের পিঠে করে পথ পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন মুসলিমরা।"[৩৬]

সুবহানাল্লাহ; এই ছিল ৬২৩ সালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কাফির-মুশরিক যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধপীড়িতদের সাথে আচরণের নমুনা!

আরও প্রায় সাড়ে বারো শ বছর পর বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধপীড়িতদের সাথে আচরণের সার্বিক নীতিমালা 'জেনেভা কনভেনশন' নির্ধারিত হয় ১৮৬৪ সালে। পরবর্তীকালে তা বিভিন্ন সময়ে হালনাগাদ করা হয়।

পরিশেষে চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের (১৯৪৯ সালে) বিভিন্ন অনুচ্ছেদে যুদ্ধকালীন সময়ে বা সামরিক সংঘাতে ধৃত ব্যক্তির মৌলিক অধিকারসমূহ নির্দিষ্টভাবে ও বিশদ ভাষায় নিরূপণ করা হয়েছে।

এবং সত্য হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জেনেভা কনভেনশন অনুসরণ করা হয় না!

কিন্তু তবু ওরাই আমাদের "মানবতা" শেখাতে চায়!

২

১৬ই জানুয়ারি, ১৯২০।

যুক্তরাষ্ট্র তার সংবিধানের ১৮তম সংশোধনী (Eighteenth Amendment to the United States Constitution) প্রকাশের মাধ্যমে মদ তৈরি, বহন ও বিক্রির ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে আমেরিকার সরকার এই আইনটি বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিল। মিলিয়ন ডলার ব্যয় হলো এই আইন বাস্তবায়নে। দুঃখজনকভাবে হিতে বিপরীত হলো এই আইন।

এই আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা শুরু করার প্রায় ৫ লক্ষ লোক জেলে গেল। ৯০ হাজারের বেশি কেইস ফাইল করা হলো সংশ্লিষ্ট অপরাধের কারণে। তাণ্ডব চালাল স্মাগলিঙের সাথে জড়িত বড়ো বড়ো মাফিয়ারা। খুন হলো হাজার হাজার মানুষ। মজার ব্যাপার হলো, প্রকাশ্যে মদ বিক্রয় কমে গেলেও লোকজন নিজের ঘরে মদের তৈরি করতে শুরু করল। ১৯২৫ সালে খোদ নিউ ইয়র্ক শহরে গড়ে ওঠে ১ লক্ষের কাছাকাছি আন্ডারগ্রাউন্ড মদ তৈরি ও পান করার পানশালা। একইসাথে, মদ উৎপাদনের প্রক্রিয়া বেশ অস্বাস্থ্যকর

[৩৬] আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী : ১/১১৯

হওয়ায় অসুখ-বিসুখ ছড়িয়ে পড়ল।

প্রায় ১৩ বছরের দুর্বিষহ সময় পার করার পরে যুক্তরাষ্ট্র তার সংবিধানের ২১তম সংশোধনী (Twenty-first Amendment to the United States Constitution) প্রকাশের মাধ্যমে পূর্বের আইন বাতিল ঘোষণা করে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৩ সালে। তথাকথিত পরাক্রমশালী আমেরিকা এই আইন প্রয়োগ করতে পারল না। বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী জাতি মদ নিষিদ্ধ করতে ব্যর্থ হল।[৩৭]

চলুন ১৪০০ বছর আগে ফিরে যাই আমরা। জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আয়াত নিয়ে হাজির হলেন—"হে মুমিনগণ! এই-যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক তিরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"[৩৮]

মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এই আয়াতটি মহান আল্লাহর পক্ষে থেকে নাযিল হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো পুলিশ বাহিনী, সেনা বাহিনী কিংবা ন্যাশনাল গার্ডের সাহায্য ছাড়াই সাহাবাদের কাছে বিধানটি বাস্তবায়ন করলেন।

কীভাবে?

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি পড়ে শোনালেন সাহাবাদের। সাহাবারা এটা শোনামাত্রই রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে ঘোষণা করলেন, মদ খাওয়ার আর কোনো বৈধতা দ্বীন ইসলামে নেই। আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি কয়েকজন সাহাবাকে (আবূ তালহা, আবূ উবাইদা, উবাই ইবনু কা'ব প্রমুখ) মদ পরিবেশন করছিলাম এবং আমরা তখন শুনলাম রাস্তায় ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে—'মদ খাওয়া এখন থেকে হারাম'। তৎক্ষণাৎ আমি হাত থেকে মদের জগ ছুড়ে ফেললাম এবং সাহাবারা সকলে হাত থেকে মদের গ্লাস ফেলে দিলেন।"[৩৯]

শুধু তাই নয়, যাদের মুখে মদ ছিল, তাঁরা সেটা মুখ থেকে থুথু করে ফেলে দিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা মদ গিলে ফেলেছেন। বমি করে পেট থেকে মদটুকু উগড়ে দিতে চেষ্টা করলেন তাঁরা। রদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাঈন। বলা

---

[৩৭] David Von Drehle (24 May 2010) "The Demon Drink" Time (New York, New York) p 56; David E Kyvig (2000) Repealing National Prohibition; The Volstead Act and Related Prohibition Documents" United States National Archives 2008-02-14

[৩৮] সূরা আল-মায়িদাহ, ০৫ : ৯০

[৩৯] বুখারি, ৭৪/ ৮; ৯৫/ ৮

হয়ে থাকে, এত এত মদের কলস-ড্রাম রাস্তায় সবাই ভেঙে ফেলেছিলেন যে, মদীনার রাস্তায় মদের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে বৃষ্টি হলে মদীনার রাস্তায় মদের গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যেত।

সুবহানাল্লাহ, 'মদ হারাম' স্রেফ এই খবর শোনামাত্রই সকলেই তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করল। কোনো পুলিশের ভয় ছাড়া, মার্কিন কংগ্রেস কিংবা ন্যাশনাল গার্ডের হস্তক্ষেপ ছাড়া। প্রয়োজন হলো না কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা লক্ষ ডলারের। বাস্তবায়িত হলো মহান আল্লাহর হুকুম।

কেন এবং কীভাবে একই আদেশ মদীনা মুনাওয়ারাতে কাজ করল কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সুপার পাওয়ার আমেরিকাতে নয়?

পার্থক্যটা ঈমানে, পার্থক্যটা তাকওয়া বা আল্লাহ ভীরুতাতে। সাহাবারা নিজেদেরকে এভাবেই মহান আল্লাহর দেওয়া আদেশগুলো মানতে নিজেদের প্রস্তুত করেছিলেন—'আমরা শুনলাম এবং মানলাম'।

৩

স্থান : জাতীয় মাসজিদ বাইতুল মুকাররমের উত্তর গেট

দিন : জুমুআ

সময় : জুমুআর সালাতের পর

প্রায় হাজার দশেক লোকের সামনে পুলিশের গাড়ি থেকে নামানো হলো ৪ তরুণকে। এরা খুনের দায়ে অভিযুক্ত। তুচ্ছ কারণে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে শেখ সামিউল আলম রাজন নামের ১৩ বছরের একটি ছেলেকে। সন্দেহাতীতভাবে খুনি হিসেবে প্রমাণিত ৪ তরুণের পক্ষ থেকে রাজনের বাবা শেখ আজিজুর রহমানের কাছে শেষবারের মতো ক্ষমা চাওয়া হলো।

শেখ আজিজুর রহমান চোয়াল শক্ত করে ক্ষমা কিংবা রক্তপণ আদায়ের দাবি নাকচ করে দিলেন। হাঁটু ভাঁজ করে খুনি ৪ তরুণকে কিছুটা দূরত্বে বসানো হলো। মাথায় পরিয়ে দেওয়া হলো কালো টুপি। লম্বা তরবারি হাতে শক্ত-শরীরের একজন হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন খুনিদের পেছনে। দুপুরের রোদে চিকচিক করছে মানুষটির তরবারি। সব মিলিয়ে মিনিট পাঁচেকের কারবার। ৪ খুনির কাটা-মাথা রাস্তার কালো পিচের ওপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। প্রাণহীন ৪টি শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে অদূরেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার করে ফেলা হলো জায়গাটিকে। এরপর সবার সামনে হাজির করা হলো আরও ৫ তরুণকে। এরা সবাই অভিন্ন অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত অভিযুক্ত। কয়েক দিন আগে রাজধানীতে এক গারো তরুণীকে জোর করে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে দেড় ঘণ্টা ধরে চলন্ত গাড়িতে ধর্ষণ করেছে এই ৫ যুবক।

কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হলো তাদের আগে। তারপর বৃষ্টির মতো পাথর বর্ষিত হলো নরাধম পশুগুলোর ওপর। ১০ মিনিট লাগলো পাষণ্ডগুলোর মৃত্যু নিশ্চিত হতে।

হাজার দশেক মানুষ দুটি ঘটনার শাস্তি দেবার স্মৃতি মননে-মগজে ধারণ করে বাসায় ফিরে গেল। নিজেদের জন্য কিছুটা শিক্ষাও নিয়ে গেলেন তরা নিশ্চিত।

পাদটীকা :

বুঝতেই পারছেন, ওপরের ঘটনাগুলো পুরোপুরি কাল্পনিক। ইসলামি শারীআ কার্যকর নেই আমাদের দেশে। যদি থাকত, চিত্রায়ণ খুব বেশি পাল্টে যেত না, এইটুকু অন্তত বলতে পারি। 'ইসলামি শারীআ' শুনলেই আমাদের মধ্যে যাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, যাদের কাছে পুরো বিষয়টিকেই 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' মনে হয়, তাদের প্রতি বিনম্র অনুরোধ—একটু ভেবে দেখবেন দৃষ্টান্তমূলক এই শাস্তিগুলোর দীর্ঘস্থায়ী কার্যকারিতা নিয়ে। এরকম একটি 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' পুরো দেশে আরও কয়েক শ 'আদিম যুগীয় বর্বরতা'র চিন্তাকে অচেনা (অ)মানুষদের অন্ধকার মনের কোন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে—সেই দিকটাও একটু লক্ষ করবেন আশা করি।

আর সব শেষে যদি সম্ভব হয়, নিজেকে একবারের জন্য পিটিয়ে-মেরে-ফেলা কিশোর রাজনের কিংবা ধর্ষিতা গারো তরুণীর দুর্ভাগা বাবার অবস্থানে কল্পনা করার সবিনয় অনুরোধ থাকল।

আপনার 'অতিশয় সুশীল মানবতাবোধ' কোনো মনুষ্যত্বের সুতোর গায়ে আটকে গেলে দুর্ভাগা পরিবারগুলোর সাথে ৫ মিনিট কথা বলেও দেখতে পারেন বৈকি!

Know Your Heroes

১

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা সাহমি রদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের প্রাথমিক দিকে মুসলিম হওয়ার গৌরব অর্জন করা একজন সাহাবি ছিলেন। তিনি মুসলিম হিসেবে তৎকালীন পৃথিবীর দুই ক্ষমতাশালী সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পারস্যের সম্রাটের কাছে ইসলাম গ্রহণের বার্তা-সহ দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের সময় বায়জেন্টাইন (রোমক) সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধের একপর্যায়ে তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় বায়জেন্টাইন সম্রাটের কাছে। সম্রাটের সাথে তাঁর আচরণ আজও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

যুদ্ধবন্দি হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রদিয়াল্লাহু আনহু-সহ আরও অনেক মুসলিমকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলো বায়জেন্টাইন সম্রাটের কাছে। সম্রাট আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে নিলেন কথা বলার জন্য। দরবারে সবার সামনে কথোপকথন শুরু হলো,

আমি বায়জেন্টাইন সম্রাট হিসেবে আপনার কাছে একটি প্রস্তাব রাখছি। আপনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে সম্মানিত করব ও মুক্তি দেব।

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা বিন্দুমাত্র সময় না নিয়ে সম্রাটের চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, আফসোস! আপনি আমাকে যেদিকে আহ্বান করছেন, তার চেয়ে হাজারবার

মৃত্যু আমার কাছে উত্তম।

– আপনাকে দেখে বুদ্ধিমান মানুষ মনে হচ্ছে। আপনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে আমি আপনাকে আমার সুন্দরী কন্যাকে বিয়ের জন্য দিয়ে দেব। পাশাপাশি আমার সাম্রাজ্যের অংশীদার হিসেবেও আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করব।

– মহান আল্লাহর শপথ! আপনার পুরো সাম্রাজ্যও যদি আমাকে দান করেন, এবং তার সাথে পুরো আরবদের যাবতীয় সম্পদও আমাকে দেওয়া হয়, তারপরেও এক মুহূর্তের জন্য আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রচার করা দ্বীন থেকে সরে আসব না।

– আপনাকে হত্যা করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকল না তা হলে।

– আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।

বায়জেন্টাইন সম্রাট আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রদিয়াল্লাহু আনহু-কে ক্রস এর ওপরে হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রাখার আদেশ দিলেন। সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন হলো না ইবনু হুযাফার জন্য। সম্রাট এবার তাঁর মাথা নিচের দিকে দিয়ে পা ওপরে রেখে বেঁধে রাখতে বললেন। সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত।

ক্ষুব্ধ সম্রাট এবার বড়ো একটি কড়াইয়ে তেল গরম করতে বললেন। সেই ফুটন্ত তেলে মুসলিম বন্দিদের একজনকে নিয়ে এসে নিক্ষেপ করা হলো। মুহূর্তেই হাড়-মাংস আলাদা হয়ে গেল মুসলিম শহীদের। সম্রাট জানতে চাইলেন আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফার কাছে, খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবেন কি না তিনি। যথারীতি না-সূচক উত্তর পেলেন সম্রাট।

সামান্য এক মুসলিম বন্দির কাছ থেকে এতটুকু মানসিক দৃঢ়তা আশা করেননি সম্রাট। এই পর্যায়ে তিনি ইবনু হুযাফাকে কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন।

পিন-পতন-নীরবতার মধ্যে দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রদিয়াল্লাহু আনহু হেঁটে গেলেন কড়াইয়ের সামনে। তাঁকে নিক্ষেপ করার সময়ে সবাই খেয়াল করলেন, তিনি কাঁদছেন! সম্রাট ভাবলেন, এইবার বন্দি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছেন, এবার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত বদলাবে।

আবার তাঁকে সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে শেষ-পর্যন্ত আপনি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করছেন?

– মহান আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুক, অবশ্যই না।

– তা হলে কাঁদছেন কেন আপনি?

– হে সম্রাট! আমার একটি মাত্র জীবন। আপনি আমাকে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করামাত্রই আমি শহীদ হয়ে যাব। আমি এই জন্য কাঁদছি। যদি আমার শরীরের পশমের সংখ্যা পরিমাণ জীবন থাকত আমার, তবে সেই জীবনগুলোর প্রতিটি জীবন আমি নিঃসংকোচে আল্লাহর রাস্তায় এই কড়াইয়ের মধ্যে উৎসর্গ করতাম।

ক্ষুব্ধ সম্রাট শেষবারের মতো অপমানের হাত থেকে বাঁচতে চাইলেন,

– আপনি ন্যূনতম আমার মাথায় একবার চুম্বন করুন। তা হলেই আপনাকে মুক্ত করে দেব আমি।

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমবারের মতো চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ। তারপরে শর্ত যোগ করে উত্তর দিলে্ন—সেক্ষেত্রে আমার সাথে বাকি সব মুসলিম বন্দিদের আপনাকে মুক্ত করতে হবে।

এবার ক্ষমতাধর বায়জেন্টাইন সম্রাটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই অবস্থা ছিল ভিন্ন। সম্রাটের আদেশের বিপরীতে ইবনু হুযাফার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। অথচ মহিমান্বিত আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থার পুরস্কার হিসেবে এখন ইবনু হুযাফা শর্ত আরোপ করলেন সম্রাটের ওপর। সিদ্ধান্ত নেওয়ার চাপ এখন সম্রাটের ওপর!

সম্রাট হ্যাঁ-সূচক উত্তর দেওয়ার পরে আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রদিয়াল্লাহু আনহু সম্রাটের মাথায় চুম্বন করলেন। বিনিময়ে তাঁকে এবং তাঁর সাথের ৮০ জন বন্দি মুসলিমকে মুক্ত করে দিলেন সম্রাট! সবাইকে নিয়ে মদীনায় ফেরত যাবার পরে খলীফা উমার রদিয়াল্লাহু আনহু-কে পুরো ঘটনা জানালেন আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রদিয়াল্লাহু আনহু।

মুক্তিপ্রাপ্ত মুসলিমদের দিকে তাকিয়ে খলীফা উদাত্ত গলায় ঘোষণা করলেন, "উপস্থিত প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফার মাথায় চুম্বন করা। আমি, আল্লাহর দাস উমার ইবনুল খাত্তাব, এর সূচনা করলাম।"

খলীফা আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফার মাথায় চুমু খেলেন। সাথে উপস্থিত সব মুসলিম তাঁর মাথায় চুমু খেলেন একজন একজন করে![৪০]

নিশ্চয়ই এই ঘটনার মধ্যে কিয়ামাত পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, উম্মাহর এমন বিষয়ের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

> "ঈমানদারদের মধ্যকার দুটি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তা হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপরও যদি দুটি দলের কোনো একটি

[৪০] হায়াতুস সাহাবা, ১/৩০২, আল-ইসাবা, ২/২৯৬-২৯৭, আল-ইসতিয়ার, সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, ১/৫১-৫৬, উসুদুল গাবাহ, ৩/১৪৩, গোল্ডেন স্টোরিজ অফ উমর ইবনুল খাত্তাব (২০১২)

অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো। যতক্ষণ-না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর যদি তারা ফিরে আসে তা হলে তাদের মাঝে ন্যায়বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়ে দাও এবং ইনসাফ করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানি করা হবে।"[৪১]

২

আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে একবার (আনুমানিক ৬৩৮ সাল, হিজরি ১৮ সাল) সমগ্র আরব উপদ্বীপে অনাবৃষ্টির কারণে দেখা দেয় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধা ও মহামারীর কারণে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এমনকি ক্ষুধার কারণে বন্য-প্রাণীরা পর্যন্ত লোকালয়ে চলে আসতে শুরু করে। মদীনা মুনাওয়ারার কাছেই আশ্রয় নেয় অসংখ্য বেদুইন। একপর্যায়ে মদীনায় সঞ্চিত খাদ্যও শেষ হয়ে যায়।

এই ঘোর দুর্যোগের সময় নেতা হিসেবে উমার রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে ফেললেন। তিনি শপথ করেছিলেন, যে পর্যন্ত এই দুর্ভিক্ষ শেষে মানুষজন স্বাভাবিক খাবার শুরু না করবে, ততদিন গোস্ত কিংবা ঘি-জাতীয় কোনো খাবার তিনি খাবেন না।

ইয়াদ ইবনু খলীফা রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করছেন, "আমি দুর্ভিক্ষের সময় উমার রদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখেছি। লালচে ফর্সা মানুষটির গায়ের রঙ কালো (তুলনামূলকভাবে) হয়ে গিয়েছিল। তিনি স্বাভাবিক (দুধ, ঘি, গোস্ত ইত্যাদি) খাবার থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন। তাঁকে বড়ো ক্ষুধার্ত দেখাত সেই সময়ে।"

পরবর্তীকালে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলে বাজারে অল্প কিছু ঘি ও দুধ পাওয়া যেতে শুরু করল। তখন তাঁর দাস ৪০ দিরহাম দিয়ে অল্প কিছু ঘি ও দুধ আনলেন আমিরুল মুমিনীন উমার রদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য। কিন্তু উমার এতে রেগে গেলেন এবং সেই খাবার সাদাকা করে দিতে বললেন। কারণ বাজারে ঘি, গোস্ত-সহ উত্তম খাবারের সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি তখনও, যদিও বেশি দামে তা কিনতে পাওয়া যেত।

উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "আমি কীভাবে মানুষদের সেবা করব বা যত্ন নেব যদি

[৪১] সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ৯–১০

আমি তাঁদের কষ্টের অনুভূতি উপলব্ধি করতে না-ই পারি?"

আসলাম মাওলা উমার বর্ণনা করেছেন, "আমরা বলাবলি করতাম—যদি মহান আল্লাহ সেই বছর দুর্ভিক্ষ তুলে না নিতেন, তা হলে উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু উম্মাহর প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধের চিন্তার কারণেই মৃত্যুবরণ করতেন।"[৪২]

সুবহানাল্লাহ! 'নেতার দায়িত্ববোধ' এর বিষয়ে এরচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত কি প্রদর্শন করতে পেরেছে পৃথিবীর কোনো নেতা বা শাসক? ইতিহাসে যতজন নেতা 'বিশ্বশান্তির জন্য নোবেল' বিজয় করেছেন, তাঁদের সবার ঘটনা একত্র করলেও এক 'খাত্তাবের পুত্র উমার ফারুক'-এর গুণাবলীর অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য কিছুর সমকক্ষ হবে কি? কখনোই না। রদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

নোবেল বিজয়ীদের 'অ-সামান্য' কীর্তির কথার চেয়ে আমরা, মুসলিমরা, আমাদের প্রকৃত নায়কদের 'অসামান্য' কীর্তিগুলোকেই হাজারগুণ উত্তম মনে করি; আল-হামদুলিল্লাহ।

৩

মদীনার তপ্ত দুপুর।

ফাতিমা রদিয়াল্লাহু আনহা-সহ ঘরের সবাই ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছেন। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন আলি ইবনু আবূ তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু। কাজের সন্ধানে মদীনা শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছালেন তিনি।

সেখানে একজায়গায় একজন মহিলাকে মাটি জমা করতে দেখলেন আলি রদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁর কাছে মনে হলো, মহিলা হয়তো মাটি ভেজাবে পানি দিয়ে। অনুমান সত্য হলো। তখন ১টি খেজুরের বিনিময়ে ১ বালতি পানি কূপ থেকে তুলে দেওয়ার চুক্তিতে কাজ নিলেন তিনি। মোট ১৬ বালতি পানি তুলে আনলেন তিনি। ভর-দুপুরে এই কষ্টকর কাজ করতে গিয়ে তাঁর হাতে লাল ফোসকা পড়ে গেল।

কাজ শেষে হাত-মুখ ধুয়ে পারিশ্রমিক হিসেবে ১৬টি খেজুর পেলেন আলি রদিয়াল্লাহু আনহু। খেজুর নিয়ে দৌড়ে হাজির হয়ে গেলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ক্ষুধার্ত ছিলেন। পুরো ঘটনা তাঁকে বললেন আলি রদিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কয়েকটি খেজুর খেলেন। বাকি খেজুরগুলো পরিবারের সবাইকে নিয়ে

[৪২] ইবনু জারীর, তারিখ, ৫/৭৮; ইবনু সাদ, তাবাকাতুল কুবরা, ৩/৩-৪-৩১৫; আলি সাল্লাবি, উমার ইবনুল খাত্তাব, ১/৪১০।

খেলেন আলি রদিয়াল্লাহু আনহু।

সুবহানাল্লাহ! ক্ষুধার তীব্র কষ্ট, পানি তোলার মতো ক্লান্তিকর ও পরিশ্রমযুক্ত কাজ শেষে পারিশ্রমিক ১৬টি খেজুর নিয়ে আলি সরাসরি নিজ পরিবারের (ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন) কাছে যাননি। বরং ছুটে গেয়েছেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে। তাঁর খাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তারপরে ছুটে গেছেন নিজ পরিবারের কাছে। সামান্য খেজুর দিয়ে দিন কাটিয়েছেন। রদিয়াল্লাহু আনহুম।

প্রকৃত 'আশেকে রাসূল' ছিলেন তাঁরাই।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় এখানে। একজন মানুষের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দেখে ভাবার কোনো কারণ নেই যে তাকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন না; কিংবা কম ভালোবাসেন। মানুষকে বিচার করতে হবে (যদি প্রয়োজনই হয়) তার তাকওয়া এবং সংশ্লিষ্ট বিপদে সবরের প্রকার দেখে; ইন শা আল্লাহ।[৪৩]

[৪৩] ইবনুল জাওযি, সিফাত আস-সাফওয়া, ১/৩২০; আলি সাল্লাবি, আলি ইবনু আবী তালিব, ১৪৮; আলি সাল্লাবি, হাসান ইবনু আলি, ৭৯-৮০।

সত্যের ঋণ

১

ইকোনোমিক্সে 'মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট' (Multiplier Effect) নামের একটি বিষয় আছে। খুব সহজ করে বললে, কোন খাতে সরকার ১০ টাকা বিনিয়োগ করলে দেশের মূল অর্থনীতিতে হয়তো ৬০ টাকা লেনদেন বেড়ে যাবে। মানি ফ্লো (Money Flow) বেড়ে যাবে এই কারণে। দেশের অর্থনীতি চাঙা হয়ে উঠবে তাতে।

আসুন আরেকটি জায়গায় এই 'মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট'-এর প্রয়োগ দেখি; ফেইসবুকে!

ধরুন আমার ফেইসবুকে ১০০০ ফ্রেন্ড আছেন। আজকে দ্বীন ইসলামের ওপরে লেখা একটি উত্তম স্ট্যাটাসে লাইক দিলাম আমি। ১০০০ জন ফ্রেন্ডের নিউজফিডে আমার লাইক দেওয়া সেই স্ট্যাটাসটি ভেসে উঠবে। এই ফ্রেন্ডসদের মধ্যে একজন আমার লাইক দেওয়া স্ট্যাটাসটি পড়লেন এবং তিনিও লাইক দিলেন। সেই ফ্রেন্ডের লিস্টে যদি ১৫০০ ফ্রেন্ডস থাকে, সেই স্ট্যাটাস চলে যাবে সেই ১৫০০ ফ্রেন্ডসদের নিউজফিডে। সেই ১৫০০ ফ্রেন্ডসদের একজন ফিডে দেখে, পড়ে লাইক ক্লিক করলেন সেই স্ট্যাটাসে। মুহূর্তেই স্ট্যাটাসটি তার ফ্রেন্ডসদের ফিডে ভেসে উঠল। চলতেই থাকে এই 'গুণন-চক্র'!

মনে করুন, আমার লাইক দেওয়া স্ট্যাটাসটি একটি উত্তম আমলের ওপর লেখা ছিল। আমি সেই আমলটি শিখে নিয়ে নিয়মিত পালন করা শুরু করলাম। আমার নিজের পুণ্যের খাতায় যোগ হতে লাগল সেই আমলের ফল, একই সাথে স্ট্যাটাসদাতার পুণ্যের খাতায়ও।

পরবর্তীকালে আমার ১০০০ জন ফ্রেন্ডসদের একজন আমার লাইকের বদৌলতে স্ট্যাটাসটি দেখলেন, পড়লেন, লাইক দিলেন, আমলটি শিখলেন এবং পালন করা শুরু করলেন। তার আমলের সুফল তার নিজের পুণ্যের খাতায় লেখা হলো। লেখা হলো আমার পুণ্যের খাতায় এবং মূল লেখকের পূণ্যের খাতায়। চলতেই থাকবে পুণ্যের জোয়ার এবং কারও পুণ্যের কোনো কম হবে না। কী অসাধারণ ব্যাপার!

ঠিক একইভাবে দ্বীন ইসলামের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো মন্দ স্ট্যাটাসে আমার ক্লিকের বদৌলতে মূল লেখক থেকে শুরু করে বিশাল এই চেইনের মধ্যের সবার পাপের খাতায় সেই কুফল যোগ হতে থাকবে। কী ভয়ংকর ব্যাপার!

এটিই সত্য যে, আমাদেরকে প্রত্যেকটি কাজের জন্য আমাদের মহান আল্লাহর কাছে নিশ্চয়ই জবাবদিহি করতে হবে। যেই কাজটিকে আমরা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করছি, সেই কাজটিরও সুফল বা কুফল এর ভার বহন করতে হবে আমাদের; সেটি সামান্য ফেইসবুকের 'অতি সামান্য' লাইক হলেও। সেই লাইক স্ট্যাটাসদাতাকে খুশি করার জন্য দেন কিংবা পড়েই দেন বা না পড়েই দেন—হয়তো বিচারে কোনো তারতম্য হবে না। আল্লাহু আ'লাম।

> "আর সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেওয়া হবে। সে সময় তোমরা দেখবে অপরাধীরা নিজেদের জীবন-খাতায় যা লেখা আছে সে জন্য ভীত হচ্ছে এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোটো বড়ো এমন কোনো কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তাদের যে যা-কিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করবেন না।"[৪৪]

হয়তো 'একটিমাত্র ক্লিক' এর মাধ্যমে লাভ করা কোনো পুণ্যই সেদিন স্থির বা ব্যালেন্স অবস্থায় থাকা আমার পাল্লার ভার পুণ্যের দিকে ভারী করে দেবে। চিরস্থায়ী উৎকৃষ্ট জান্নাত আমার জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। কিংবা 'একটিমাত্র ক্লিক'-এর মাধ্যমে লাভ করা কোনো পাপ সেদিন আমার স্থির পাল্লাকে পাপের দিকে ভারী করে দেবে। চিরস্থায়ী নিকৃষ্ট জাহান্নাম আমার জন্য বরাদ্দ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ তাআলা মাফ করুক।

পাঠকবৃন্দ! বুঝতে পারছেন কি 'একটিমাত্র ক্লিক' কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে আমাদের জন্য?

---

[৪৪] সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ৪৯

২

ওরা ৮ জন। ৫ জন ছেলে, ৩ জন মেয়ে।

বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি রাস্তার পাশ-ঘেঁষে-গজিয়ে-ওঠা ঘাসের ওপরে বসে আড্ডা দিচ্ছে সবাই। ভার্সিটি পড়ুয়া সবাই—দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মাঝে একটি ছেলে হাঁটু ভেঙে শুয়ে আছে পাশের মেয়েটির কোলে মাথা রেখে। মেয়েটি ধরে আছে ছেলেটির হাত। থেকে থেকে ছেলেটির কপালে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে।

এককথায়, অশ্লীল লাগছে দৃশ্যটি।

আমি অফিস থেকে ফিরছি। ঢাউস সাইজের একটি খাম হাতে দাঁড়িয়ে পাক্কা ২ মিনিট ভাবলাম। তারপর 'বিসমিল্লাহ' বলে এগোতে লাগলাম তাদের দিকে। নিজের বুকের ভেতরের দুপদুপানি শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছি।

সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। মাথা ঘুরিয়ে ফিরে তাকালেন ৩/৪ জন। বাকিরা আড্ডায় ব্যস্ত। বিনয়ের সাথে জানতে চাইলাম তারা মুসলিম কি না। হ্যাঁ-সূচক উত্তর পেয়ে মেয়ের কোলে-মাথা-রেখে-শুয়ে-থাকা ছেলেটিকে তাদের সম্পর্ক জানতে চাইলাম। উঠে বসতে বসতে জানাল, 'আমরা সবাই ফ্রেন্ডস।'

আমি বড়ো করে নিশ্বাস নিলাম। বললাম, "মহান আল্লাহকে ভয় করুন। আপনি যে আপনার মেয়ে বন্ধুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন, এটি স্পষ্ট হারাম কাজ। জাহান্নামের আগুনকে আমাদের সবার ভয় করা উচিত।"

"হোয়াট দ্যা **?"

আমি থামলাম না। ছেলেটির চোখের দিকে তাকিয়ে নরম-স্বরে বলতে থাকলাম, "হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'তোমাদের জন্য হালাল নয় এমন কোনো নারীর হাত স্পর্শ করার চেয়ে কেউ যদি লোহার পেরেক দিয়ে নিজ মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সেটিও তার জন্য উত্তম।' লোহার পেরেক আপনার মাথায় ঢুকে যাচ্ছে—এই বিষয়টি চিন্তা করতে পারেন কি?"

"ওই মিয়া, মাথার নাটবল্টু লুজ নাকি?"

"ভাই আমার! আমি পাগল না। যা বললাম, নিশ্চয়ই আপনার ভালোর জন্যই বলেছি।"

এই পর্যায়ে প্রায় অনুমিতভাবেই উঠে এসে কলার চেপে ধরলেন ভাইদের একজন। অশ্রাব্য ভাষায় গালি ভেসে আসছে কানে। পাগল, মোল্লা, মাথায় গন্ডগোল, তারছেঁড়া,

গাঞ্জাখোর, ধান্ধাবাজ—এগুলো সবচেয়ে ভদ্রোচিত সম্ভাষণ। ৫ জন ছেলের মধ্যে ১ জন আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছেন। বাকি ৪ ভাই আমাকে ধরতে চাইছেন। বোনেরা ভাইদের পেছন থেকে টেনে ধরছেন। আমি শুধু বলার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম, "আমি ভুল বা খারাপ কোনো কথা বলিনি।"

আশেপাশের মানুষজন ততক্ষণে জমা হয়ে গেছে। কী হয়েছে কেউ ঠাহর করতে পারছে না। উদ্যত ৪ ভাইয়ের একজন এসে গলাধাক্কা দিয়ে ঘাস থেকে রাস্তায় পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। হাতের খামটি ধাক্কাধাক্কিতে মাটিতে পড়ে গেছে। সেটি তুলে নিয়ে দুমড়ে-যাওয়া-শার্টের-কলার ঠিক করতে করতে বললাম, "আপনারা আমাকে মনে হয় অসুস্থ ভাবছেন। আমি অসুস্থ না। হারাম একটি বিষয় চোখের সামনে পড়াতে ভুলটি ধরিয়ে দিতে চাইছিলাম শুধু। আমার কথাগুলো আপনাদের কাছে বেমানান-অপরিচিত লেগেছে, আমি জানি। মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'ইসলাম শুরু হয়েছে অপরিচিত অবস্থায়, পুনরায় অপরিচিত অবস্থায়ই ফিরে যাবে। সুতরাং সুসংবাদ সেই অপরিচিতদের জন্য।'

পেছন থেকে গালির তুবড়ি ফোটাতে ফোটাতে তেড়ে আসতে নিলেন ২ ভাই। বাকিদের বাধার জন্য পৌঁছতে পারলেন না আমার কাছে। বাধা দেওয়া ভাইদের একজন এসে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বিদায় জানালেন আমাকে, "যা ব্যাটা, ভাগ। নিজের রাস্তায় চল।"

ভাইদের উদ্দেশে সালাম দিয়ে ঘটনা বোঝার চেষ্টারত জড়ো হওয়া ৮/১০ জন পথচারীদের মাঝখান দিয়ে আমি নিজের রাস্তায় চলা শুরু করলাম।

****

আমার কথা :

১. অনলাইনে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার কিছুটা চেষ্টা করে আসছি বছর কয়েক। অফলাইনে দাওয়াত তুলনামূলকভাবে কঠিন, এইটুকু জানতাম। ঠিক কতটুকু কঠিন, আজকে যেচে জানার চেষ্টা করলাম। এবং জানলাম।

২. এই ইয়াং ভাই-বোনদের দিকে হাঁটতে শুরু করার আগেই মাথায় এসেছিল যে এদেরকে দিয়ে বোধহয় আমার অফলাইন দাওয়াত শুরু করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ভয় যে পাচ্ছিলাম, সেটি অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। তারপরেও আগে বেড়েছি। শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে আমি দূরে সরাতে পেরেছিলাম, আল-হামদুলিল্লাহ।

৩. আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম এমন প্রতিক্রিয়ার জন্য। এই লেখাটি লিখছি আর

ভাবছি—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাদের ওপর দ্বীন ইসলাম প্রচারের জন্য কী ধরণের অত্যাচার হয়েছিল। আমার ওপরে যা হয়েছে তা অত্যন্ত নগণ্য। তাতেই আমার মন ভয়ংকর খারাপ হয়ে আছে। ভাবতেই পারছি না, তাদের কাছে কেমন লাগত!

৪. আমার গায়ের চামড়া মোটা না। অবশ্যই অপমানিত বোধ করেছি। লজ্জা পেয়েছি জড়ো হওয়া মানুষদের সামনে। কলার চেপে ধরার পরে এবং বুকে ধাক্কা দেওয়ার সময়ে আমার হাত উঠে যাচ্ছিল রিফ্লেক্সের কারণে। মাথা ঠান্ডা রাখা একজন দাঈর জন্য অত্যন্ত জরুরি। আল-হামদুলিল্লাহ, সামলাতে পেরেছি নিজেকে। আমার সম্মানের চেয়ে দ্বীনের সম্মান জরুরি।

৫. আমি কিন্তু সেই ভাই-বোনদের খারাপ মনে করছি না। তাদের এই বয়সে পুরো পৃথিবীকে রঙিন লাগে। এখন থেকে বছর খানেক আগে আমাকেও যদি কেউ এভাবে দাওয়াত দিতেন, আমিও হয়তো রিঅ্যাক্ট করতাম (হয়তো এত বাজেভাবে করতাম না)। সমস্যা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে এইভাবে দাওয়াত দেওয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। সেই কারণেই আমাকে অসুস্থ মনে হয়েছে তাদের। এইভাবে প্রকাশ্যে যদি সব ভাই-বোনেরা আশেপাশের অশ্লীলতার বিপরীতে নম্রভাষায় দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন, খুব শীঘ্রই ভালো ফল মিলবে ইন শা আল্লাহ।

৬. হারাম বিষয়গুলো সমাজের ভেতর এমনভাবে ঢুকে গেছে যে, "স্বভাবিক বিষয়ের সংজ্ঞা পাল্টে গেছে। কুরআনের আয়াত কিংবা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস পর্যন্ত কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি করে না আমাদের মনে। আমাদের সবার উচিতস, নিজ পরিবার থেকে দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করা। অবস্থার উন্নতি অবশ্যই হবে একটা সময়ে, বিইযনিল্লাহ।

সবশেষে আমার সেই ভাই-বোনদের হিদায়াতের জন্য দুআ করছি মহান আল্লাহর কাছে। আমি জানি যে, কোনো ভুল করিনি আমি। এইভাবে যখনই সম্ভব হয়, সত্য বলার তাওফীক যেন মহান আল্লাহ দেন আমাকে। দুআ করছি, আমাদের সবার সকল দাওয়াতগুলো যেন কবুল করে নেন মহান আল্লাহ।

আমাদের কাজ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো। আর হিদায়াত তো একমাত্র তাঁর হাতে।

৩

মুসলিম-মাত্রই একজন দাঈ ইলাল্লাহ বা মহান আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী। নিজের

অতি সীমিত জ্ঞানে এই দায়িত্ব পালন করার নিতান্ত চেষ্টা করে যাই আমি। আমি এটিও স্থির বিশ্বাস করি য, অনলাইনের দাওয়াহ'র চেয়ে অফলাইনের দাওয়াহ অনেক বেশি কার্যকারী। নিজের সীমিত সামর্থ্যে এই সম্মানিত কাজটি করার সময় মাঝে মধ্যে প্রচণ্ড হতাশা ঘিরে ধরে আমাকে। কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট প্রমাণসাপেক্ষে কিছু প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে যখন অতি কাছের, অতি পরিচিত, আত্মীয়-স্বজনদের বোঝাতে ব্যর্থ হই, নিজেকে বড়ো অথর্ব মনে হয় তখন। 'এই সামান্য ও সহজ বিষয়টি বুঝিয়ে বলার সামর্থ্যও নেই আমার'—এই অনুভূতি অতি কষ্টের। কিছু সময় তো এমনও আসে, যখন মনে হয় আমি তাকে/তাদেরকে বোঝাতে পারলে তাদের জীবন-দর্শন পর্যন্ত পাল্টে যেত।

আফসোসের সীমা ক্রমাগত বাড়তে থাকে তখন। কষ্টের মেঘ আরও ঘনীভূত হয়। হতাশার পেছন থেকে টেনে ধরে শক্ত করে। এই অপ্রকাশ্য অনুভূতি থেকে অনেকটা মুক্তিই দিলেন এক বড়ো ভাই। স্রেফ একটি কথাই বলেছিলেন তিনি—"মন খারাপ করবেন না ভাই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুক। পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দাঈ ইলাল্লাহ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আপন চাচা আবূ তালিবকেও বোঝাতে পারেননি। তাঁর কেমন লেগেছিল, ভেবেছেন কখনও? সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু সুদূর পারস্য থেকে ঘুরতে ঘুরতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে মুসলিম হয়েছেন। খুন, রাহাজানি আর ডাকাতি করে বেড়ানো বেদুইন গোত্র 'আল-গিফার'-এর যুবক আবূ যর রদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আপন চাচা দ্বীন ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য লাভ করেননি। হিদায়াত মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বড়ো নিয়ামাত।"

পুনশ্চ : এই স্ট্যাটাসটি আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। আমি যাকে হিদায়াতের উজ্জ্বল আলো হিসেবে বিশ্বাস করছি, আরেকজনের কাছে সেই একই বিষয়কে গোমরাহীর গাঢ় অন্ধকার মনে হতেই পারে।

ভয়ংকরতম চিন্তার বিষয় হলো, নিশ্চয়ই আমাদের দুজনই সঠিক ও সত্য হতে পারবে না। কিয়ামাতের দিন আমাদের দুজনের মধ্যে যে-কোনো একজন সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হবে! মাত্র একজনই সাফল্যে উদ্ভাসিত হবেন।

অপ্রিয়-কথন

খেলা। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি-র সংজ্ঞানুযায়ী 'খেলা' অর্থ এমন কর্মকাণ্ড যেখানে চিত্তবিনোদনের জন্য নিজেদেরকে সংযুক্ত করা হয়। (...an activity that one engages in for amusement)।

আমাদের সমাজের আজকের অবস্থার সাথে খেলার সংজ্ঞা মিলাতে গেলে 'গণপিটুনি' খাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমরা নিজেদের অজান্তেই সামান্য খেলাকে এমন সিরিয়াস পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি, যা কিছু ক্ষেত্রে আতংক সৃষ্টি করছে। নিতান্ত পরিচিত আত্মীয়কেও যদি ডেকে এনে খেলাধুলার নামে মাত্রাতিরিক্ত ঘৃণার কথা বোঝাতে যাই, আমাকে পাগল বলেই ধরে নেবে সে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ না-ই করলাম!

খেলাধুলার এই দর্শন বর্তমানে যে ভয়াবহ একটি অসুখের জন্ম দিয়েছে, তা হলো 'অন্ধ জাতীয়তাবাদ'। খেলাধুলার ব্যপকতার ফলে এখন একটি দল যেন একটি দেশের প্রতিচ্ছবি। খেলার মাঠে মুখোমুখি দুটি দল যেন মুখোমুখি দুটি দেশ। খেলার মাঠে তারা যতটা না চিত্তবিনোদনের জন্য সংযুক্ত, তার চাইতে বহুগুণ হিংসার অঙ্গারে জ্বলেন তাদের সমর্থকরা। জাতীয়তাবাদের এই বিষ অনেক দূর গড়িয়ে গেছে এইসব 'স্পোর্টস এন্টারটেইনমেন্ট'-এর ওপর ভর করে।

ঠিক এইভাবেই খেলাধুলার মতো একটি শরীরচর্চাকে ব্যাবসা ও এন্টারটেইনমেন্টে রূপ দিয়ে অন্ধ জাতীয়তাবাদের সুপ্ত আগুনে ছিটানো হচ্ছে তেল। আর সমর্থকরাও অজ্ঞাতসারে অন্ধ জাতীয়তাবাদের আবেগে এমন অদ্ভুত সব আচরণ করছেন, যা হয়তো এই এন্টারটেইনমেন্টের অস্তিত্ব না থাকলে তারা করতেন না।

একটি কথা বিশ্লেষণ করলেই সত্যটুকু পরিষ্কার হয়ে উঠবে আপনার সামনে।

মনে করুন, আজকে ভারত বনাম পাকিস্তানের খেলা। সমীকরণ যদি এমন হয় যে ভারত পাকিস্তানকে হারাতে পারলেই কেবল বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো—আমাদের মধ্যে কয়জন দেশপ্রেমিক ভারতকে সমর্থন না করে থাকতেন?

কিংবা ঠিক উল্টোটি যদি হতো—পাকিস্তান ভারতকে হারাতে পারলে তবেই কেবল বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে, ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদরা কি লজ্জা পেতেন না আমাদের 'একদিনের-পাকিস্তান-প্রেম' দেখে?

আফসোস! সত্যিই যদি এই ধরণের এন্টারটেইনমেন্টের নামে খেলাধুলা আমাদের গেলানো না হতো, তা হলে হয়তো বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচের আগে কেউ বলত না যে '৭১-এর মতো আবার হারাতে চাই তাদের'। কিংবা বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের আগেও শুনতে হত না যে 'আমার বোন ফেলানী হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার দিন আজ'।

অথচ এইসব খেলাধুলা নাকি পিউর এন্টারটেইনমেন্ট!

এন্টারটেইনমেন্ট না কি মানসিক বিকারগ্রস্ততা?

(গালাগালি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। তবে না করলে কৃতজ্ঞ থাকব।)

****

বন্ধু ছাড়া লাইফ ইম্পসিবল। 'বন্ধু ছাড়া লাইফ ইম্পসিবল', এ-জাতীয় কর্পোরেট স্লোগান শুনে ও ব্যবহার করে অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু কোনোদিন কি একটু ভেবে দেখেছেন আপনার লাইফ ইম্পসিবল করে দেওয়া সেই বন্ধুরা কারা?

মানুষমাত্রই ভুল করে। ভুলের ঊর্ধ্বে আমরা কেউ না। শয়তান আমাদেরকে ধোঁকায় ফেলার জন্য অহর্নিশি তার বন্ধুদের নিয়ে চেষ্টায় আছে। এর মধ্যেই আমাদের যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে যেতে হবে। এই পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং ভালো কাজে এগিয়ে থাকা-এর বিষয়ে আমাদের বন্ধুদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একজন মুসলিমের চারপাশে এমন সব বন্ধু থাকা প্রয়োজন, যারা তাকে ভালো কাজে সাহায্য করবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মাহ। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য। তোমরা নেকীর হুকুম দিয়ে

থাকো, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। এই আহলি কিতাবরা ঈমান আনলে তাদের জন্যই ভালো হতো। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।"[৪৫]

অথচ আমরা বন্ধু হিসেবে তাদেরকেই চিনি, যারা আমাদের যাবতীয় মন্দ কাজের সহযোগী এবং সাক্ষী। যার সাথে আমার যত বেশি খারাপ কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেই আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু।

কী অদ্ভুত!

সত্য তো এই, পৃথিবীর এই বন্ধুদের বিষয়ে আমরা কিয়ামাতের সেই ঘোর দুর্যোগে আক্ষেপ করব।

"হায়! আমার দুর্ভাগ্য, হায়! যদি আমি অমুক লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম। তার প্ররোচনার কারণে আমার কাছে আসা উপদেশ আমি মানিনি। মানুষের জন্য শয়তান বড়োই বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে।"[৪৬]

এটিই চূড়ান্ত সত্য, এই বন্ধুদেরকেই আমরা ঘোরতর শত্রু হিসেবে কিয়ামাতের দিন আবিষ্কার করব।

"বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে আল্লাহ-ভীরুরা নয়।"[৪৭]

তাই আমাদের বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে সাহায্য করে, এমন মানুষদেরই আমাদের বন্ধু হিসেবে নেওয়া উচিত। একইভাবে আমাদেরকে যারা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আমাদের উচিত হবে তাদের ভালো কাজে সাহায্য করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া।

"সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা।"[৪৮]

একটি বিষয় মনে রাখবেন। যে বন্ধুটি আপনাকে অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার অনুরোধ

---

[৪৫] সূরা আ ল ইমরান, ০৩ : ১১০
[৪৬] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৮–২৯
[৪৭] সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩ : ৬৭
[৪৮] সূরা আল-মায়িদাহ, ০৫ : ০২

করে আপনার কোনো মন্দ কাজে বাধা দিচ্ছে, তাকে হয়তো আপনার এখন অসহ্য লাগছে। তাকে হয়তো আপনার কাছে বেকুব-ব্যাকডেটেড মনে হচ্ছে, তাকে হয়তো আপনি সচেতনে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছেন ইদানীং। তবে নিশ্চিত থাকুন, সে-ই আপনার 'প্রকৃত বন্ধু'। মহান আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করুক এবং রক্ষা করুক, এমন না হয়, কিয়ামাতের দিন আমি জাহান্নামের আগুনে থাকব, আর সেই প্রকৃত বন্ধু জান্নাত থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বেঁচে যাবার জন্য শুকরিয়া জানাবে।

> "তোমরা কি দেখতে চাও, সে এখন কোথায় আছে? এ বলে যেমনি সে নিচের দিকে ঝুঁকবে তখনই দেখবে তাকে জাহান্নামের অতল গভীরে। এবং তাকে সম্বোধন করে বলতে থাকবে, আল্লাহর কসম! তুই তো আমাকে ধ্বংসই করে দিতে চাচ্ছিলি। আমার রবের মেহেরবানি না হলে আজ আমিও যারা পাকড়াও হয়ে এসেছে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।"[৪৯]

যদি আমরা বুঝতাম!

মুসলিম পুরুষদের সবার বিশাল একটি দায়িত্ব রয়েছে তাদের পরিবারের প্রতি। আমরা পুরুষরা কোনো নারীর সন্তান বা ভাই কিংবা স্বামী। আমাদের অনেকের সাথেই আমাদের মা-বোনরা থাকেন। স্ত্রীদের কথা তো বলাই বাহুল্য। আমাদের পরিবারের সব সদস্যদের বিষয়ে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে, জানি কি আমরা?

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "সাবধান! প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব, সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দাস তার মনিবের সম্পদের বিষয়ে দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব, প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৫০]

---

[৪৯] সূরা আস-সফফাত, ৩৭ : ৫৫–৫৭
[৫০] মুসলিম, ৩৩/২৪; আবূ দাউদ, ২০/২৯২২

আমাদের মধ্যে এমন অনেক পুরুষই আছেন, যারা নিজেদের স্ত্রীদের চালচলনের বিষয়ে পুরোপুরি উদাসীন। স্ত্রী পর্দা করল কি না, সালাত ঠিকভাবে আদায় করল কি না, আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। প্রসঙ্গত বলতে বাধ্য হচ্ছি , পর্দা বা হিজাব সালাত-সাওমের মতোই ফরয।

স্ত্রী ফেইসবুকে হাজারও মানুষের সাথে নিজের আকর্ষণীয় ছবি শেয়ার করছে। সেই ছবিতে শত-শত কমেন্টস করছে গায়ের মাহরামরা। স্বামী নির্বিকার; কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীর বিষয়ে গর্বিতও বটে! নাউযুবিল্লাহ।

আমরা পুরুষরা, কি 'দাইয়ূস' নামটি সম্পর্কে জানি? ইংরেজিতে অনুবাদ করলে সোজা-কথায় 'Cuckol' বলা যায়।

'দাইয়ূস' হলো সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীকে ও পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে অশ্লীল কাজের সুযোগ করে দেয় বা কোনো বাধাপ্রদান করে না এবং তাদের সকল শারীআ-বিরোধী কাজকে মেনে নেয়। মহান আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন 'দাইয়ূস'-দের দিকে তাকাবেনও না এবং জান্নাত তার জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সালিম বিন আবদুল্লাহ তার বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন প্রকার মানুষের দিকে মহান আল্লাহ তাআলা পুনুরুত্থান দিবসের দিন তাকাবেন না,

১. যে মাতা-পিতার অবাধ্য।

২. যেই নারী, যে তার সাজসজ্জায় পুরুষের অনুকরণ করে এবং

৩. দাইয়ূস।[৫১]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য মহান আল্লাহ তাআলা জান্নাত হারাম করেছেন—

১. যে মদ তৈরি করে।

২. যে মাতা-পিতার নাফরমানি করে এবং

৩. ওই চরিত্রহীন ব্যক্তি (দাইয়ূস) যে নিজ স্ত্রীকে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার করতে সুযোগ দেয়।[৫২]

আমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রীরা হিজাব পালন করে, তাদের ছবিও বা কেন দিতে হবে

---

[৫১] নাসাঈ, ২৫৬৩
[৫২] আহমাদ, ৫৮৩৯

ফেইসবুকে? হাতের কবজি ও মুখমণ্ডল দেখানো জায়েজ বলে যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেই, তারপরেও অযথা কেন সেই হিজাব করা ছবি সবার সাথে শেয়ার করবেন তারা? কাকে দেখাতে চাচ্ছেন তারা, বা কাকে দেখাতে চাচ্ছি তাদেরকে আমরা?

আর যদি পর্দার বিধান অনুসরণ না-ই করেন তারা, তা হলে এমনিতে দিনে গড়ে একশত (১০০) মানুষ তাদের চেহারা ও শরীরের অন্যান্য অংশ দেখত হয়তো। কিন্তু ফেইসবুকের মাধ্যমে দিনে ন্যূনতম পাঁচ হাজার (৫,০০০) মানুষকে নিজেদের চেহারা ও শরীরের অন্যান্য অংশ দেখানোর সুযোগ করে দিচ্ছেন তারা। একই সাথে সেই পাঁচ হাজার (৫,০০০) মানুষের গুনাহের একটি অংশও নিজের 'একাউন্টে' জমা করছেন তারা। আমরাও বড়ো আনন্দে থাকি তা নিয়ে।

আমাদের মা-বোন-স্ত্রীরা শুধু এক ফেইসবুকে ছবি আপলোড করেই গুনাহ ২০ গুণ, ৩০ গুণ থেকে ১০০ গুণ, ৫০০ গুণ করে ফেলছেন। কোনো কারণ ছাড়া, অযথাই। আমাদের পুরুষদের (নাকি সরাসরি দাইয়ূস-ই বলব?) কি কোনো খেয়াল আছে সেদিকে? মানুষ নিজের পুণ্য কীভাবে কতগুণ বাড়ানো যায়, সেটি নিয়ে চিন্তিত থাকে বলে জেনে এসেছি। পরিবারের ও নিজেদের গুনাহ কতগুণ বাড়ানো যায়, সেই দিকেও অনেক ভাই নজর দেওয়া শুরু করেছেন বোধ করি।

আহ! যদি আমরা বুঝতাম!

****

খোলা চিঠি

দয়া করে ক্ষমা করবেন আমাকে। মনের কষ্ট মনে চাপা দিতে ব্যর্থ হয়ে লেখনীতে তুলে আনার জন্য একান্তই দুঃখিত। আবার এড়িয়েও যেতে পারছি না।

মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে খোলা চিঠি...

অনলাইনে দ্বীন ইসলাম নিয়ে প্রচুর উপকারী লেখা চোখে পড়ছে ইদানীং। আল-হামদুলিল্লাহ। সেইসব স্ট্যাটাসের কমেন্টের একটি বড়ো অংশ জুড়ে থাকে একটি কমন কমেন্ট—আমীন।

এটি অবশ্যই উত্তম কথা। লেখার বক্তব্যের সাথে একমত প্রকাশ করে সেই বিষয়ে সাহায্য-প্রার্থনা করা হয় 'আমীন' কমেন্ট করে। কিন্তু প্রায় অনেক সময় ভয়ংকর বৈপরীত্য দেখা যায় 'আমীন' কমেন্টের সাথে সাথেই।

উদাহরণ দেওয়া যাক।

১. স্ট্যাটাস দেওয়া হলো—"ধর্ম যার যার, উৎসবও তার তার।" স্ট্যাটাসে লাইক ও কমেন্টে মুহূর্তেই 'আমীন' বলে এক ভাই গিয়ে শারদীয় দুর্গাপূজার নবমীতে অমুক মণ্ডপে সবান্ধব যাবার বিস্তারিত প্ল্যান স্ট্যাটাসাকারে আপলোড করে দিলেন।

২. স্ট্যাটাসের বিষয়—নিজের পরিবারের ছবি গায়েরে মাহরামদের সাথে ফেইসবুকে শেয়ার না করার বিষয়। লাইক ও কমেন্ট (আমীন) করার ১০ মিনিটের মাথায় নিজের স্ত্রীর সাথে বিনাপর্দার সেলফি আপলোড।

৩. সুদীর্ঘ স্ট্যাটাসে কুরআন, হাদীস ও ইজমা দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে বাদ্যযন্ত্র-সহ গান হারাম। যথারীতি লাইক ও কমেন্ট শেষ। পরমুহূর্তেই স্ট্যাটাস—Listening to the hit number of *****. A sheer talent, man! Simply made my day!"

এমন উদাহরণ অসংখ্য। মহান আল্লাহ ক্ষমা করুক।

আসলে কাকে খুশি করতে চাচ্ছি/চাচ্ছেন? স্ট্যাটাসদাতা কে?? আরেকটু ঘুরিয়ে বলি, কাকে বোকা বানাতে চাইছেন? স্ট্যাটাসদাতা কে? নাকি মহান আল্লাহ তাআলাকে?

> "অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে মহান আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে।"[৫৩]

মহান আল্লাহর ওয়াস্তে 'আমীন' কমেন্ট বন্ধ করুন, যদি সেই 'আমীন' মন থেকে না আসে। যদি সেই 'আমীন'-এর সম্মান ১০ মিনিটও রাখতে না পারেন, তবে কমেন্ট না করাই উত্তম নয় কি?

না জেনে করা পাপের ভয়াবহতা একরকম। সুস্পষ্ট পাপ জেনেও সেটি করার ভয়াবহতা আরও বেশি। ৫ মিনিট আগে কমেন্ট করা 'আমীন' ও ৫ মিনিটের মধ্যেই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কাজ যাতে কিয়ামাতের দিন 'কোনোভাবে বেঁচে' যাবার পথকে অবরুদ্ধ না করে—খেয়াল রাখা জরুরি নয় কি?

মহান আল্লাহ কমেন্টে 'আমীন-সর্বস্ব মুসলিম' হওয়া থেকে রক্ষা করুক আমাকে ও আপনাকে; আমাদেরকে।

---

[৫৩] সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১৪২

ধর্ম যার যার, বুঝও তার তার

অমঙ্গল যাত্রা

যেইসব মুসলিম ভাই-বোন বৈশাখের এক তারিখের '(অ)মঙ্গল শোভাযাত্রা'য় যাবেন বলিয়া পণ করিয়াছেন, তাহারা নিজের দুইটি সহীহ হাদীস পড়িয়া লইয়া নিজেদের চিত্রকর বন্ধুদের 'সুসংবাদ' পৌঁছাইয়া দিতে পারেন।

সাওবান রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত ঘটবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল মুশরিকের সাথে মিলিত হয় এবং যতক্ষণ-না তারা (উম্মাতের একদল) মূর্তিপূজা করে।"[৫৪]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

> "প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামের অধিবাসী। তার অঙ্কিত প্রতিটি ছবিতে প্রাণ দেওয়া হবে, তখন সেগুলি জাহান্নামে তাকে আযাব দিতে থাকবে।"

ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, একান্তই যদি তা (ছবি অঙ্কন) করতে হয়, তা

---

[৫৪] তিরমিযি, ২২১৯

হলে গাছপালা এবং যার প্রাণ নেই সেই সবের ছবি অঙ্কন করো।[৫৫]

আর যাহারা রমনার বটমূল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় শিরক, কুফরি ও হারাম কর্মকাণ্ড দেখিয়া হৃদয় ও চোখ জুড়াইবেন বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহারা নিচের আয়াতটি পড়িয়া লইতে পারেন।

> "অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। তারা কি নির্ভীক হয়ে গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহর আযাবের কোনো বিপদ তাদেরকে আবৃত করে ফেলবে অথবা তাদের কাছে হঠাৎ কিয়ামাত এসে যাবে, অথচ তারা টেরও পাবে না?"[৫৬]

অতএব, আগামীকাল ওই সব স্থানে মহান আল্লাহ তাআলার আযাব আসিলে দয়া করিয়া অবাক হইবেন না। যেই হৃদয় ও চোখ দিয়া শিরক, কুফরি ও হারাম কর্মকাণ্ড দেখিয়া পুলকিত হইবেন বলিয়া ভাবিতেছেন, মহান আল্লাহ তাআলা সেই হৃদয় লইয়া যাইতেও পারেন। সেই চোখ মুহূর্তের মধ্যে চিরজীবনের জন্য অন্ধ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতাও তিনি নিশ্চিত রাখেন।

পরিশেষে একটি কথাই বলিতে চাই।

আপনাদের আনন্দ মাটি করিতে চাহি নাই আমি। আপনারা ইসলামবিরোধী ওই সকল কর্মকাণ্ডে জড়াইলে আমার কিছুই যাইবে-আসিবে না। অনুরূপভাবে, আপনারা ওই সব কর্মকাণ্ড হইতে নিজেদেরকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দূরে সরাইয়া রাখিলেও আমি দুই পয়সা অতিরিক্ত কামাই করিব না।

আপনার পাপ ও পুণ্যের ভার আপনারই কেবল।

> "যে ব্যক্তিই সৎপথ অবলম্বন করে, তার সৎপথ অবলম্বন তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, তার পথভ্রষ্টতার ধ্বংসকারিতা তার ওপরই বর্তায়। কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। আর আমি (হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝাবার জন্য) একজন পয়গম্বর না পাঠিয়ে দেওয়া পর্যন্ত কাউকে আযাব দিই না।"[৫৭]

****

[৫৫] মুসলিম, ৫২৭২
[৫৬] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৬-১০৭
[৫৭] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ১৫

ধর্ম যার যার, বুঝ-ও তার তার

১লা জানুয়ারিকে "New Year's Day" হিসেবে উদ্‌যাপনের ইতিহাস—ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর জন্মের ৪৬ বছর আগে থেকেই ১লা জানুয়ারিকে "New Year's Day" হিসেবে পালন করে আসছিল রোমক সম্রাটগণ। আধুনিক গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারও সেই ধারাবাহিকতায় ১লা জানুয়ারিকে বছরের দিন বা "New Year's Day" হিসেবে পালন করে আসছে।

প্রশ্ন হচ্ছে কোথা থেকে ১লা জানুয়ারি এল? ইতিহাসে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায় এই বিষয়ে।

(১) রোমান সাম্রাজ্যের মুশরিকরা Janus (জ্যাইনাস/ইয়ানুস) নামে এক ঈশ্বরের ইবাদাত করত যাকে তারা মানত 'God of gates, doors, and beginnings' বা 'শুরুর স্রষ্টা' হিসেবে। মূলত তারা অনেকজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী ছিল। তার মধ্যে Janus ছিল অন্যতম।

Janus এর মূর্তির দুইটি মাথার একটি সামনের দিকে মুখ করা এবং অন্যটি পেছনের দিকে মুখ করা। দুপাশে দুটি মাথা দ্বারা নির্দেশ করে Janus সামনে ও পেছনে—সবদিকেই দেখতে পায়। প্রতীকীভাবে এটি বোঝায়, সে অতীত ও ভবিষ্যৎ দেখতে পায় ও ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে। এই Janus-এর নাম অনুসারে বছরের প্রথম (beginning) মাসের নাম দেওয়া হয় January. ১লা জানুয়ারিকে 'New Year's Day' হিসেবে পালন করার মূল উপাদ্য ছিল যাতে তাদের ঈশ্বর Janus খুশি হয়, যাতে তাদের বছরের যাত্রা শুভ হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ৩১ ডিসেম্বরের আনন্দ উদ্‌যাপন সেই Janus এর প্রতি একটি ভালো যাত্রার আনন্দময় সমাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুসঙ্গ হয়ে উঠত।[৫৮]

(২) পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ১৭৫২ সাল থেকে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারকে অনুসরণ করার আরও অনেক আগে থেকেই ১লা জানুয়ারিকে, "New Year's Day" হিসেবে পালন করে আসছে। খ্রিষ্টীয় মতবাদ অনুসারে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মের অষ্টম দিন তাঁর খাতনা (Circumcision) করা হয়েছিল এবং সেই কারণে একটি প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখান থেকেই ১লা জানুয়ারিতে আনন্দ প্রকাশ করত তারা। এখন পর্যন্ত Anglican Church এবং Lutheran Church এই

[৫৮] The Calendar of the Roman Republic, Michels, A K p.97-98; Roman Religion, Warrior Valerie, p.110

রীতি অনুসারে ১লা জানুয়ারিতে আনন্দ প্রকাশ করে।[৫৯]

পুনশ্চ : এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন,

> "এসব লোক কি আল্লাহর এমন কোনো শরীকে বিশ্বাস করে, যে এদের জন্য দ্বীনের মতো এমন একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছে আল্লাহ যার অনুমোদন দেননি? যদি ফায়সালার বিষয়টি পূর্বেই মীমাংসিত হয়ে না থাকত, তা হলে তাদের বিবাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া হতো। এ জালিমদের জন্য নিশ্চিত কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।"[৬০]

চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ওপরের আয়াতে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[৬১]

ধর্ম যার যার, বুঝও তার তার।

---

[৫৯] Dictionary of Theological Terms, McKim, Donald, p.51; A Companion for the festivals and fasts of the Protestant Episcopal Church, Hobart, John Henry, p.284

[৬০] সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ২১

[৬১] আবূ দাঊদ, ৪০৩১

কাছে আসার গল্প?

নিউজফিডে ক্লোজআপ বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন ঘুরে বেড়াচ্ছে—ভালোবাসা দিবস ২০১৭ উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'ক্লোজআপ কাছে আসার সাহসী গল্প' প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত সেরা তিন গল্প নিয়ে নির্মিত হবে ভালোবাসা দিবসের তিনটি নাটক।

ক্লোজআপ বাংলাদেশের পোস্টের লেখাটা পড়ুন এবার—"আজকাল ভালোবাসা হচ্ছে অনলাইনেই। কিন্তু একটু দেখা, একটু স্পর্শের যে ভালোলাগা, তা কি আছে অনলাইনে? শুধু চ্যাটিং বা ভিডিও কলে খোঁজ নিয়ে ভালোবাসার সবটুকু পূর্ণতা কি মেলে কখনও? ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষ্যে তোমার 'কাছে আসার অফলাইন গল্প'টি লিখে পাঠাও।" ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।

সবিনয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই এই বিষয়ে।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস-এর ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-সহ আরও বহু রেফারেন্স থেকে জানা যায়, রোমান এক খ্রিস্টান পাদরির নাম ছিল ভ্যালেন্টাইন। চিকিৎসাবিদ্যায় সে ছিল অভিজ্ঞ। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অভিযোগে ২৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াসের আদেশে ভ্যালেন্টাইনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সে যখন বন্দি ছিল তখন তরুণ-তরুণীরা তাকে ভালবাসা জানিয়ে জেলখানায় জানালা দিয়ে চিঠি ছুড়ে দিত। বন্দি অবস্থাতেই সেন্ট ভ্যালেন্টাইন জেলারের অন্ধ মেয়ের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার চিকিৎসা করে। মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মৃত্যুর আগে মেয়েটিকে লেখা এক চিঠিতে সে লিখে যে, "ফ্রম ইউর ভ্যালেন্টাইন।"

অনেকের মতে, সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের নামানুসারেই পোপ প্রথম জুলিয়াস ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' হিসেবে ঘোষণা দেয়। ইতিহাস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তথাকথিত ভালোবাসা দিবস কখনোই এদেশীয় সংস্কৃতির অংশ ছিল না। আর মুসলমানদের তো নয়ই।

বর্তমান অবাধ তথ্য-প্রবাহের যুগে স্যাটেলাইটের কল্যাণে মুসলিম সমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করছে। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তারা আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের কর্মকাণ্ডে মুসলিম জাতির উঁচু শির নত হচ্ছে। অথচ এটা বহুপূর্বে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করে গেছেন।

আবূ আকিদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার যাত্রায় মূর্তিপূজকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। তাদের নিকট যে গাছটির নাম ছিল 'জাতু আনওয়াত'। এর ওপর তির টানিয়ে রাখা হতো। এ দেখে কতক সাহাবি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্যও এমন একটি 'জাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন,

> সুবহানাল্লাহ, এ তো মূসা আলাইহিস সালাম-এর জাতির মতো কথা। আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরি করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়। আমি নিশ্চিত, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে।"[৬২]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন বলে গণ্য হবে।'[৬৩]

মানুষের অন্তর যদিও অনুকরণপ্রিয়, তবুও মনে রাখতে হবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ বিচারে এটি গর্হিত, নিন্দিত। বিশেষ করে অনুকরণীয় বিষয় যদি হয় আকীদা, ইবাদাত, ধর্মীয়-আলামত-বিরোধী, আর অনুকরণীয় ব্যক্তি যদি হয় বিধর্মী, বিজাতি। দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্রমশ ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে আসছে এবং বিজাতিদের অনুকরণ ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি আরম্ভ করছে। যার অন্যতম ১৪ ফেব্রুয়ারি বা ভালোবাসা দিবস। মুসলমানদের জন্য এসব দিবস পালন জঘন্য অপরাধ।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন,

[৬২] তিরমিযি, ৫৪০৮; সহীহ
[৬৩] আবূ দাঊদ, ৪০৩১; আহমাদ, ২/৫০; সহীহ

"কাফিরদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাদের শুভেচ্ছা জানানো একটি কুফরি কাজ। কারও দ্বিমত নেই এতে। যেমন তাদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে 'শুভেচ্ছা' বলা, শুভ কামনা জানানো। এগুলো কুফরি-বাক্য না হলেও ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে হারাম। কারণ এর অর্থ হলো, একজন লোক ক্রুশ, মূর্তি ইত্যাদিকে সাজদা করছে, আর আপনি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এটা একজন মদ্যপ ও হত্যাকারীকে শুভেচ্ছা জানানোর চেয়েও জঘন্য।"[৬৪]

অনেক ভাই-বোন অবচেতনভাবেই এ সকল অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, অথচ তারা জানেও না, কত বড়ো অপরাধ তারা করে যাচ্ছে। শিরক ও কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, ধন্যবাদ দিচ্ছে। এভাবে আল্লাহর শাস্তিতে নিপতিত হচ্ছে।

মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছেদন হচ্ছে আমাদের পথিকৃৎ সাহাবা, নেককার পূর্ব-পুরুষদের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যারাই বিশ্বাস করে, 'আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল'—তাদের উচিত ও কর্তব্য, মুসলমানদের মুহাব্বত করা, কাফিরদের ঘৃণা করা, তাদের সাথে বৈরিভাব পোষণ করা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করা। এতেই আমরা নিরাপদ, এখানেই আমাদের কল্যাণ, অন্যথা সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, আমরা তাদের আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করি না, শুধু আপসে মুহাববত, ভালোবাসা তৈরি করার নিমিত্তে এ দিনটি পালন করি। অথচ এর মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়, ব্যভিচার প্রসার লাভ করে। একজন সতী-সাধ্বী পবিত্র মুসলিম নারী বা পুরুষ এ ধরনের নোংরামির সাথে কখনও জড়িত হতে পারে না।

এ দিনটি উদ্‌যাপন কোনো স্বভাব সিদ্ধ ও স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বরং একজন ছেলেকে একজন মেয়ের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার পাশ্চাত্য কালচার আমদানিকরণ। আমরা জানি, তারা সমাজকে চারিত্রিক পদস্খলন ও বিপর্যয় হতে রক্ষা করার জন্য কোনো নিয়ম-নীতির ধার ধারে না। যার কুৎসিত চেহারা আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। তাদের অশালীন কালচারের বিপরীতে আমাদের অনেক সুষ্ঠু-শালীন আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে।

মুসলিম সমাজে এক সময় নীতি-নৈতিকতার মূল্য ছিল সীমাহীন। লজ্জাশীলতা ও শুদ্ধতা ছিল এ সমাজের অলংকার। কোনো অপরিচিত মেয়ের সাথে রাস্তায় বের হবার চেয়ে পিঠে বিশাল ভার বহন করা একটা ছেলের জন্য ছিল অধিকতর সহজ। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা চিন্তা করারও অবকাশ ছিল না। অথচ সেই অবস্থা থেকে আজ আমরা কোথায়

[৬৪] আহকামুয যিম্মাহ

এসে পৌঁছেছি! এটা হচ্ছে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-র মতো অশ্লীলতার কুফল। এসবের দ্বারা সরল, পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক মানুষ বিপথগামী হচ্ছে।

মুসলিম-মাত্রই বিশ্বাস করে যে, বিয়ে ছাড়া একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের মেলামেশা সুস্পষ্টভাবে হারাম। এই বিষয়ে বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন বোধ করছি না শুধু একটি হাদীস ছাড়া। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "তোমাদের জন্য হালাল নয় এমন কোনো নারীর হাত স্পর্শ করার চেয়ে কেউ যদি লোহার পেরেক দিয়ে নিজ মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সেটিও তার জন্য উত্তম।"[৬৫]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রকাশ্য পাপ এবং গোপন পাপ। আমরা সবাই জানি যে, প্রকাশ্য পাপ তুলনামূলকভাবে গোপন পাপের থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ। গোপন পাপ মহান আল্লাহ ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এই-সংক্রান্ত বেশ কিছু হাদীসও রয়েছে। উলামাদের ঐকমত্য রয়েছে যে, প্রকাশ্য পাপ একটি ভয়ংকর গুনাহ। প্রকাশ্য পাপের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে। সমাজে ফিতনা সৃষ্টি হয়। প্রকাশ্য পাপের মাধ্যমে অন্যান্য মুসলিম ভাই-বোনেরা অশ্লীলতার দিকে আকৃষ্ট হয়। একইসাথে, কেউ প্রকাশ্যে হারাম কাজ করলে এটিই মনে হয় যে বিষয়টির গভীরতা সম্পর্কে তার ধারণা নেই অথবা ধারণা থাকলেও মহান আল্লাহর বিধি-নিষেধকে সে থোড়াই কেয়ার করছে। যদি দ্বিতীয়টি (থোড়াই কেয়ার) হয়, তবে সেটি কুফরের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে বৈকি।

দ্বীন ইসলাম সেকারণেই প্রকাশ্য পাপকে অত্যন্ত গর্হিত বিষয় মনে করে। আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

> "আমার সকল উম্মাত মাফ পাবে, তবে পাপ-প্রকাশকারী ব্যতীত। আর একপ্রকার প্রকাশ এমন যে, কোনো ব্যক্তি রাতে কোনো পাপ কাজ করে, যা মহান আল্লাহ গোপন রাখেন। কিন্তু সকাল হলে সে বলে বেড়ায়, 'হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি।' অথচ সে এমন অবস্থায় রাত পার করেছিল যে, মহান আল্লাহ তার পাপ গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু সে সকালে উঠে তার ওপর মহান আল্লাহর আবৃত পর্দা খুলে ফেলে!"[৬৬]

আমেরিকা ও ইউরোপের লোকজন একই উৎসবে মেতে উঠতে পারে। কারণ তারা

[৬৫] আলবানি, আল জামি', ৫০৪৫
[৬৬] বুখারি, মুসলিম

এক জাত, এক সভ্যতা, এক সংস্কৃতি, এক ধর্ম এবং একই ধারার লোক। এক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাই আনন্দ-বেদনার অনুভূতি সর্বত্র অভিন্ন। কিন্তু আমাদের দেহ পৃথক, ওদের চেয়ে আমরা পৃথক প্রায় সব ক্ষেত্রে। তবুও যখন তারা নিজেদের জন্য ডুগডুগি বাজায় তখন আমরা কেন নাচি? বিলাতের ভ্যালেন্টাইন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে মুসলিমরাও যদি একইভাবে এ দিবসটি পালন করে, তা হলে তাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়? আমরা মুসলিম। ভ্যালেন্টাইন আমাদের নয়, ওদের- এ জ্ঞানটুকুও নেই, এটাই আজ আমাদের জন্য বড়ো ট্রাজেডি!

অতএব যে-কোনো মূল্যে এ সমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে-থাকা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব।

পাঠকবৃন্দ! নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অন্যতম ব্র্যান্ড 'ক্লোজআপ' এই 'কাছে আসার সাহসী গল্প' প্রতিযোগিতা আয়োজন, গল্প বাছাই, শ্রেষ্ঠ ৩টি গল্প নির্বাচন এবং সেই গল্প ভিত্তি করে নাটক নির্মাণ ও প্রচারের মাধ্যমে কীভাবে একটি হারাম ও গর্হিত কাজকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসছে এবং হারাম বিষয়ে প্রতিযোগিতা করার মানসিকতা সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে। শুধু ইউনিলিভার না আরও অনেক দেশী মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশান দীর্ঘদিন ধরে এ কাজটি করে আসছে। নাউযুবিল্লাহ।

দুর্গন্ধময় স্থানে বেশিদিন থাকলে সেই দুর্গন্ধ সহ্য হয়ে যায়। একইভাবে, হারামের সাথে বসবাস করতে করতে ইদানীং আমাদের এইসব ভয়ংকর বিষয়কেও অতি তুচ্ছ মনে হয়। আমরা কি কোনোভাবেই টের পাচ্ছি না যে এই 'কাছে আসার গল্প' আসলে জাহান্নাম এর লেলিহান আগুনের কাছে যাবার গল্প?

রাতের আঁধারে হঠাৎ কোথাও আলো জ্বালালে পোকামাকড়ের দল যেভাবে আগুনের কাছে এসে আত্মাহুতি দেয়, এই 'কাছে আসা' কি সেইরকম কাছে আসা নয়? তবে কি এখনও সতর্ক হবেন না এবং নিজের পরিচিতদের সতর্ক করবেন না এই ভয়ংকর বিষয় থেকে?

সিদ্ধান্ত আপনার!

মহান আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করুন। আমীন।

অগ্ন্যুৎসব

এ লেখাটি নিশ্চিত করেই আমার ফ্রেন্ডস এবং ফলোয়ারদের মধ্যে অনেকের পছন্দ হবে না। তারপরেও সবাইকে অনুরোধ করব পড়ার জন্য। একই সাথে অনুরোধ করব নিজের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের উপকারের নিয়তে শেয়ার করার জন্য। মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে তাদের প্রতি দাওয়াহ হিসেবে কবুল করুক।

ঠিক ১ ঘণ্টা আগে যদি আমি নিজেও এই কাজ করে থাকি, তবে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। শুধু ১ মিনিট আগপর্যন্ত কোনো বিষয় সঠিক বলে স্থির বিশ্বাস থাকলেই সেই বিষয়টি সত্য বা হালাল হয়ে যায় না, যদি না ১ মিনিট পরেই আমি পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের আলোকে তার বিপরীতে কিছু খুঁজে পাই। হক এবং বাতিল এর মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য খুঁজে পাবার পরে কোনো মুসলিমের কি দ্বিধাবিভক্ত হওয়া উচিত?

এই আমি ২০১২-১৩ সালেও বার্থ ডে-ম্যারেজ ডে-মাদার্স ডে-ফাদার্স ডে-ভ্যালেন্টাইনস ডে-রেইনি ডে-সানি ডে ইত্যাদিতে উইশ করেছি। নিজেও অন্যদের কাছ থেকে এই সব ডে-তে উইশ আশাও করতাম। মহান আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করুক আমাকে। এই আমি নিজে নিজের বিবেক ব্যবহার করে যুক্তি বানিয়েছিলাম–

"আমি তো আর মন থেকে পালন করছি না; শুধু শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আল্লাহ তাআলা পরম করুণাময়। আমার নিয়ত তো শুধু তাদের খুশি রাখা।"

অথচ আমার শুধু এক আল্লাহ তাআলাকেই খুশি রাখার কথা। দয়াময় আল্লাহ তাআলা

আমার 'সুযোগ গ্রহণ'-কে ক্ষমা না করলে কী উপায় হবে আমার?

প্রথমত : মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য অন্য কোনো ধর্মের উৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দ-প্রকাশ বা সম্ভাষণ ইসলাম ধর্মে হারাম; কিছু পর্যায় ভেদে শিরকের মতো গুনাহ্।

এই উৎসবগুলো হতে পারে,

১) দুর্গাপূজা, কালীপূজা (দিওয়ালি), সরস্বতী পূজা, জন্মাষ্টমী, রথটানা, চৈত্র-সংক্রান্তি, নবরাত্রি ইত্যাদি।

২) খ্রিস্টীয় বড়োদিন বা ক্রিস্টমাস, হ্যালোয়েন, ইস্টার সান ডে ইত্যাদি।

৩) ইহুদি স্যাবাত, গুড ডে ইত্যাদি।

৪) বৌদ্ধ পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, বিশাখা পূজা ইত্যাদি।

ওপরের প্রত্যেকটি উৎসব পৃথিবীর বুকে ও আকাশের নিচে সর্বনিকৃষ্ট পাপ শিরকের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এরচেয়ে বিস্তারিত কিছু লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না।

প্রায় একই কারণে আরও বেশ কয়টি উৎসব পালন কিংবা সম্ভাষণ ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উৎসবগুলো মোটামুটি এই রকম :

১) গ্রেগরিয়ান নতুন বছর উদ্‌যাপন বা 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' সম্ভাষণ জানানো।

২) বাংলা নতুন বর্ষ পালন, মঙ্গল শোভাযাত্রা, রমনা বটমূলে প্রভাত-বরণ বা শুভ নববর্ষ সম্ভাষণ জানানো/পহেলা ফাল্গুন, পহেলা শ্রাবণ ইত্যাদি পালন।

৩) জন্মদিন বা বার্থ ডে পালন বা 'হ্যাপি বার্থ ডে' সম্ভাষণ জানানো।

৪) বিবাহ-বার্ষিকী বা 'হ্যাপি ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি' সম্ভাষণ জানানো।

৫) মাদার্স ডে/ফাদার্স ডে/ভ্যালেন্টাইনস ডে, ফ্রেন্ডশিপ ডে ইত্যাদি পালন বা সম্ভাষণ জানানো।

৬) মৃত্যুবার্ষিকী/চল্লিশা/তিরিশা/তিন দিন/সাত দিন ইত্যাদি।

ওপরের সব কয়টি অনুষ্ঠান পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের আলোকে স্পষ্টত 'Innovation' বা 'বিদআত'। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবিরা পরবর্তী তাবিয়ি ও তাবি-তাবিয়িদের কেউ এই জাতীয় কোনো অনুষ্ঠান পালন করেছেন বলে কোনো দলিল (সহীহ, হাসান, দাঈফ/দুর্বল বা মাউদু/জাল) খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ মুসলিম উম্মাহ এর সর্বোত্তম তিনটি প্রজন্মই তাঁরা।

ইসলামি শারীআতে এই সব বার্ষিকীর কোনো বিধান নেই। কুফফারদের প্রচলিত কিংবা কুফফারদের রীতি অনুসারে চলে-আসা এই সব অনুষ্ঠানের সাথে যাবতীয় সম্পৃক্ততাকে ইজমার প্রেক্ষিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সম্মানিত উলামারা।

> "এসব লোক কি আল্লাহর এমন কোনো শরীকে বিশ্বাস করে যে এদের জন্য দ্বীনের মত এমন একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছে আল্লাহ যার অনুমোদন দেননি? যদি ফায়সালার বিষয়টি পূর্বেই মীমাংসিত হয়ে না থাকত, তা হলে তাদের বিবাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া হতো। এ জালিমদের জন্য নিশ্চিত কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।"[৬৭]

> "অতপর হে নবি! আমি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাকে একটি সুস্পষ্ট পথের (শারীআতের) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার ওপরেই চলো এবং যারা জানে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না—আল্লাহর মোকাবিলায় তারা তোমরা কোনো কাজেই আসতে পারে না। জালিমরা একে অপরের বন্ধু এবং মুত্তাকীনদের বন্ধু আল্লাহ।"[৬৮]

> "তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথিদের অনুসরণ করো না।"[৬৯]

> "এ আনুগত্য (ইসলাম) ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ব্যর্থ, আশাহত ও বঞ্চিত।"[৭০]

> রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় তৈরি করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[৭১]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "তোমরা (দ্বীনের) নব প্রচলিত বিষয়সমূহ থেকে সতর্ক থাকো। কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয় বিদআত এবং প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা।"[৭২]

[৬৭] সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ২১
[৬৮] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৮-১৯
[৬৯] সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : ০৩
[৭০] সূরা আ ল ইমরান, ০৩ : ৮৫
[৭১] বুখারি, মুসলিম
[৭২] আবূ দাউদ, ৩৯৯১; তিরমিযি, ২৬৭৬

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী মহান আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের মধ্যে) নব-উদ্ভাবিত বিষয়। আর নব-উদ্ভাবিত প্রত্যেক বিষয় বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত হলো ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।"[৭৩]

আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে আগমন করলেন, আর মদীনাবাসীর দুটি দিন ছিল যাতে তারা বিনোদন বা খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই দিন দুটি কি?' তারা বলল, 'আমরা এই দিনে জাহিলি যুগে খেলাধুলা করতাম।' তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে এই দিন দুটির পরিবর্তে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। আর তাহলো ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আযহার দিন।[৭৪]

ওপরের হাদীসের মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম ও অন্য ধর্মের যাবতীয় উৎসবের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে সামনে এসেছে বৎসরে দুটি মাত্র দিন; ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আযহার দিন। মোদ্দা কথা, মুসলিম উম্মাহর জন্য বাৎসরিক আনন্দের দিবস মাত্র দুইটি।

১. ঈদুল ফিতর

২. ঈদুল আযহা

এই দুইটি দিন ছাড়া মুসলিম উম্মাহর অন্য কোনো বার্ষিক আনন্দের দিন নেই এবং বার্ষিক দুঃখের দিন নেই।

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আহকামুল যিম্মাহ' গ্রন্থে বলেন, "কুফফারদের যেসব আচার শুধুই তাদের থেকে সৃষ্ট, সেগুলোতে অভিনন্দন জানানো ইজমার ভিত্তিতে হারাম। যেমন 'শুভ উদ্‌যাপন' বা 'তুমি যেন এটি উপভোগ করো' ইত্যাদি বলা। এমনটা বললে কুফর যদি নাও হয় তবু তা হারাম। এটি কাউকে মদপান, হত্যা বা ব্যভিচারে অভিনন্দন জানানোর সমতুল্য। যে-কোনো ব্যক্তিকে অবাধ্যতা, বিদআত বা কুফরের জন্য অভিনন্দন জানায়, সে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত করে।"

অতএব এই সকল বার্ষিকী পালন ও শুভেচ্ছা জানানো হারাম, যদিও তারা সহকর্মী হয়। এগুলো মুসলিমদের উৎসব নয় এবং মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলিমদের

---

[৭৩] মুসলিম, ১৫৩৫, নাসাঈ, ১৫৬০
[৭৪] আবূ দাঊদ, ১১৩৪

জন্য এসব উৎসবের দাওয়াত গ্রহণ হারাম। কারণ এর অর্থ ওই উৎসবে অংশ নেওয়া যা শুভেচ্ছা জানানোর চেয়েও নিকৃষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।"[৭৫]

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম মুখালিফাত আসহাবুল জাহীম'-এ বলেন, "তাদের উৎসবে তাদের অনুকরণের অর্থ হলো তাদের কুফরি বিশ্বাস ও আচারের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা।"

পুনশ্চ : লেখার মূল অংশে আমি নিজের একটি কথাও যোগ করিনি ওপরন্তু ইবনু তাইমিয়্যা ও ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুমুল্লাহ ফেইসবুক আলিম বা ইউটিউব শাইখ নন।

তারপরেও অনেক ভাই-বোন এর বিপরীতে যুক্তির পাহাড় দাঁড় করাবেন। অবশ্যই এই যুক্তির পাহাড়ের ভিত্তি তাকওয়ার ওপরে নয়। অনিবার্য ধ্বংসই এর পরিণতি।

আমরা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, যেন তিনি মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে গর্বিত করেন এবং ইসলামকে দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে সাহায্য করেন।

ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

****

ওপরের লেখাটি লেখাটি শিরকের সাথে সংশ্লিষ্ট যে-কোনো উৎসবের আগে পোস্ট করি। উদ্দেশ্য—একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। পাশাপাশি আশায় থাকি, নেহায়েত একজন মুসলিম ভাই কিংবা বোনও যদি মূল বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্বীনের পথে ফিরে আসেন ইন শা আল্লাহ।

---

[৭৫] আবূ দাউদ, ৪০৩১

ট্রোজান হর্স

১

পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনের মধ্যে একটি ইন্টারেস্টিং পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীতে কোনো কিছুই শতভাগ খাঁটি না; সেটি যে-কোনো বিষয়ই হোক না কেন। পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম বিষয়ের মধ্যেও আপনি কিছু-না-কিছু মন্দ বিষয় খুঁজে পাবেন। একইভাবে সকল মন্দ কিছুর মধ্যেও খুঁজে দেখলে একটু হলেও ভালো কিছু পাবেন। কোনো কিছুই Absolute ভালো বা Absolute খারাপ নেই পৃথিবীতে; পিউর কিছু নেই। অবশ্যই ভালো ও খারাপের মিশ্রণ পাবেন।

কিন্তু আখিরাতের সবকিছুই Absolute ভালো কিংবা Absolute খারাপ। জান্নাতে আপনি ভালো ছাড়া মন্দ কিছু খুঁজে পাবেন না। একইভাবে জাহান্নামে মন্দ ছাড়া ভালো কিছু নেই। হয় পিউর ভালো, না হয় পিউর খারাপ।

পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে এই ভালো ও খারাপের মিশ্রণকেই সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র বানায় শয়তান।

মনে করুন, কোনো একটি কাজের ৫ শতাংশ ভালো দিক আছে; বাকি ৯৫ শতাংশই খারাপ। শয়তান সেই কাজের যে ৫ শতাংশ ভালো, সেইটুকুকেই আপনার কাছে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করবে। যদি শয়তানের সেই ৫ শতাংশ ভালোর লোভে পড়ে আপনি কাজটি শুরু করেন, খুব সহসাই দেখবেন আপনাকে বাকি ৯৫ শতাংশ খারাপ ঘিরে ফেলেছে।

মহান আল্লাহ তাআলা রক্ষা করুক আমাদের। আমাদের উচিত হবে কোনো নতুন বিষয়—যা দ্বীন ইসলামের মাধ্যমে স্বীকৃত নয়—গ্রহণ করার আগে ভালো ও খারাপের

মিশ্রণের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করা।

জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।

২

'ভালো-মন্দ মিলিয়ে মানুষ। যার যা খারাপ, সেটুকু বাদ দিন। খারাপ বাদ দিয়ে শুধু ভালোটা নিন।'

দুঃখজনকভাবে ওপরের বিষয়টি আমাদের অনেকের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। বিষয়টি যদি দুনিয়াবি কিছু হয়, হয়তো সমস্যা নেই তেমন। কিন্তু দ্বীন ইসলাম সংক্রান্ত বিষয়ে কস্মিনকালেও এই মতবাদ অনুসরণ করা উচিত না। এটি নাফসের প্ররোচনা।

সালাফদের রীতি থেকেও এটি প্রমাণিত। যার যেটুকু ভালো, সেটুকু গ্রহণ করা—এটি যদি সালাফদের পন্থা হতো, তবে হাদীসের রাবীদের জীবন-যাত্রার মান, আচার-ব্যবহার যাচাইয়ের প্রয়োজন হতো না। সেই সূত্রে সহীহ, হাসান, দঈফ হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস হতো না। আসমাউর-রিজাল তথা 'রিজাল শাস্ত্র'-এর প্রয়োজনও পড়ত না তখন! কিছু প্রমাণ দেওয়া যাক।

১. বিখ্যাত তাবিয়ি, বহু সাহাবির ছাত্র ইমাম ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহ বলেন,

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

> "নিশ্চয়ই এটি দ্বীনের জ্ঞান, সুতরাং তোমাদের এই দ্বীনের জ্ঞান কার কাছ থেকে অর্জন করছ তা ভালো করে দেখে নাও।"[৭৬]

২. আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ রহিমাহুল্লাহ মিনহাল ইবনু উমার থেকে গ্রহণ করতেন না, কারন তিনি মিনহালের ঘর থেকে তুম্বুর[৭৭]-এর আওয়াজ পেয়েছিলেন!

৩. ইমাম হাকাম ইবনু উতাইবা রহিমাহুল্লাহ রাবী জা'দান থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন না কেননা সে বেশি কথা বলত! তিনি সিমাক ইবনু হারব থেকেও হাদীস গ্রহণ করতেন না, কারণ সে তাকে দাঁড়িয়ে প্রসাব করতে দেখেছেন![৭৮]

৪. ইমাম শু'বা রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি অমুক ব্যক্তির হাদীস

[৭৬] মুসলিম, মুকাদ্দিমা, ১/১৫

[৭৭] একতারার মতো একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র।

[৭৮] খতিব বাগদাদি, আল-কিফায়াহ ফি ইলমির রিওয়ায়াহ, ১১০-১১৪

কেন তরক করেন? তিনি বললেন, আমি তাকে তুর্কি ঘোড়াসমূহের ওপরে ওঠার সময় (অকারণে) পদাঘাত করতে দেখতাম। তাই আমি তার হাদীস তরক করেছি।[৭৯]

উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত রাবীগণদের প্রতি যে সকল ত্রুটির কারণে হাদীস গ্রহণ করা হয়নি, সেগুলো আসলে এত বড়ো দোষ নয় বা ইলমুল জরাহ ও তা'দীলে ততটা গুরুত্বও রাখে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব ছোটোখাটো ভুলগুলোও মুহাদ্দিসীনরা এড়িয়ে যেতেন না।

সুবহানাল্লাহ, এই যদি হাদীসে নববি গ্রহণের মানদণ্ড হয়, তবে পূর্ণ দ্বীন গ্রহণের মানদণ্ড কী হওয়া উচিত? দ্বীনের ইলম গ্রহণের তাকাজায় তা হলে আমরা কেন এত সহজভাবে দ্বীনকে যার-তার কাছ থেকে গ্রহণ করছি?

শরীয়তে কোনটি ভালো আর কোনটি খারাপ, এটি বিজ্ঞ আলিমগণ ছাড়া সকলেই বুঝবেন না। এক্ষেত্রে যারা দ্বীনি জ্ঞানে বিজ্ঞ নন, তারা তো তাদের অজান্তেই ধোকায় পড়ে যাবে। তখন এর দায়ভার কে নিবেন?

শেষ করব ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ-এর একটি কথা দিয়ে। কেন ভ্রান্ত দাঈদের, আহলুল বিদআহ-এর সমালোচনা করা হয়, সেটি হয়তো স্পষ্ট হবে অনেকের কাছে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে বলা হলো, একব্যক্তি (নফল) রোজা রাখে, সালাত আদায় করে, ই'তিকাফ করে, তার চেয়ে কি আপনার নিকট আহলুল বিদআতের সমালোচনা করা বেশি পছন্দের?

তিনি বললেন, যখন সে (নফল) সালাত আদায় করে এবং ই'তিকাফ করে তখন সে নিজের জন্যে করে। কিন্তু যখন সে আহলুল বিদআহ-এর বিরুদ্ধে বলে, সেটি মূলত মুসলিম-সম্প্রদায়ের (কল্যাণের) জন্যে করে। সুতরাং এটি বেশি মর্যাদাপূর্ণ।[৮০]

বিভক্তি সৃষ্টি নয়, কারও বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশে নয় বরং শুধু উম্মাহ'র কল্যাণের নিয়তে ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই লেখাটি লেখা। আর আল্লাহ তাআলা নিয়তের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিদান দিবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের দ্বীনের পথে কবুল করুক। আমাদের হিদায়াত দান করুক। কার কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করব, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকার তাওফীক দান করুক।

আল্লাহুম্মাহদীনা ফী মান হাদাইত।
ওয়া আ ফীনা ফী মান আফাইত।
বারাকাল্লাহু ফী কুম।

---

[৭৯] আল-কিফায়াহ ফি ইলমির রিওয়ায়াহ, ১১০
[৮০] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমাউল ফাতাওয়া, ২৮/২৩১-২৩৩

এক উম্মাহ, এক দেহ?

১

এক কৃষক আর তার স্ত্রী ছোটো একটি গ্রামে থাকতেন। ছোটো সেই বাড়িতে ছিল একটি ইঁদুর। একদিন ইঁদুরটি খাটের নিচে তাকিয়ে দেখল, কৃষক আর তাঁর স্ত্রী মিলে একটি ইঁদুর মারার কল ফাঁদ হিসেবে পেতেছে। ছোটো ইঁদুর দ্রুত বাড়ির বাইরে বের হয়ে এল। সামনে পড়ল কৃষকের মুরগি।

ইঁদুর হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিল মুরগিকে, বাড়ির ভেতরে ফাঁদ হিসেবে একটি ইঁদুর মারার কল বসানো হয়েছে।

মুরগি খুব একটা পাত্তা দিল না এই খবর, আসলে এই খবরে আমার খুব একটা আগ্রহ নেই কারণ ফাঁদ আমার জন্য না। যাই হোক, তুমি একটু সাবধানে থেকো।

বাধ্য হয়ে বেচারা ইঁদুর সামনে এগিয়ে গেল, খুঁজে পেল কৃষকের ছাগলটিকে। উত্তেজিত ইঁদুর সেই একই ভয়ের কথা জানাল, বাড়ির ভেতরে ফাঁদ হিসেবে একটি ইঁদুর মারার কল বসানো হয়েছে। কিছু একটা করো দয়া করে।

ছাগলও বিরক্ত হলো এমন ইস্যুতে। ছোটো ইঁদুরকে বোঝানোর চেষ্টা করল ছাগল, দেখো, ওই ফাঁদ আসলে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি কেন ইঁদুর মারার কল বসানোর কারণে চিন্তিত হব? আমার আসলে কিছুই করার নেই এই বিষয়ে।

নিরুপায় ইঁদুর শেষ আশ্রয় হিসেবে ছুটে গেল কৃষকের গরুর কাছে। হন্তদন্ত ইঁদুর নিজের ভয়ের কথা জানাল গরুকে, বাড়ির ভেতরে ফাঁদ হিসেবে একটি ইঁদুর মারার কল বসানো

হয়েছে। দয়া করে কিছু করো।

যথারীতি ইঁদুরের অনুরোধ কানে তুলল না গরু। মুখে কৃত্রিম সহানুভূতি ফুটিয়ে তুলল ইঁদুরের জন্য, হুমম। খুবই চিন্তার কথা তোমার জন্য। কিন্তু আমার জন্য তো এই খবরে ভয়ের কিছুই দেখছি না।

কারও কাছ থেকে কোনো সাহায্য না পেয়ে ব্যর্থ মনে ঘরে ফেরত এল ইঁদুর। ইঁদুর মারার কল থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে হবে আমাকে, ভাবল সে।

পরদিন গভীর রাতে হঠাৎ শব্দ করে উঠল ইঁদুর মারার কলটি। জেগেই ছিল কৃষক। ইঁদুর মারা পড়েছে ভেবে অন্ধকারেই কলটি হাত দিয়ে টেনে আনতে চাইল কৃষক। বেচারা দেখতে পায়নি, ইঁদুরের বদলে আসলে বিষধর এক সাপের লেজ আটকা পড়েছিল সেই কলে। আহত সাপ সাথে সাথে ছোঁবল বসিয়ে দিল কৃষকের হাতে!

প্রতিবেশীরা ধরাধরি করে সে রাতেই কৃষককে হাসপাতালে নিয়ে গেল। প্রাণে বেঁচে গেল কৃষক। দুদিন পরে বাড়ি ফিরলেও খুব দুর্বল বোধ করতে লাগল সে। স্বামীর ভালো-মন্দ কিছু খাওয়া উচিত, এই ভেবে নিজেদের মুরগিটি জবাই করে স্বামীর জন্য স্যুপ বানাল কৃষকের স্ত্রী।

পরদিন কিছুটা সুস্থ বোধ করল কৃষক। ডাক্তারবাবু এসে দেখে গেলেন তাকে। যাবার সময় কৃষকের স্ত্রীকে জানিয়ে গেলেন, সাপে-কাটা রোগীকে সেরে উঠতে অনেক সাহায্য করে ছাগলের মাংস।

নিমেষেই জবাই হয়ে গেল ছাগলটি।

এদিকে আত্মীয়-স্বজনরা খবর পেয়ে সবাই ছুটে এল কৃষককে দেখতে। পুরো বাড়ি ভর্তি মেহমান। পরবর্তী শুক্রবারে কৃষকের সেরে-ওঠা-উপলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতিতেই বিশাল খানাপিনার আয়োজন হলো।

এবারে খাঁড়া পড়ল গরুর গলায়। আর এইদিকে চৌকাঠের ওপরে বসে এই কয়দিনের যাবতীয় ঘটনা চুপচাপ দেখে গেল ছোটো সেই ইঁদুর!

পাদটীকা : আমার আজকের সমস্যাই হয়তো আগামীকাল আপনার সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। কারও সমস্যাকেই তুচ্ছ মনে করার কারণ নেই। ঘরের চার কোনার যে-কোনো এক কোনা ধসে পড়লেই পুরো ঘর ভেঙে পড়া সময়ের ব্যাপার মাত্র![৮১]

---

[৮১] বিদেশী গল্প অবলম্বনে

২

মক্কার তপ্ত বালুর ওপর পুড়ছে প্রভাবশালী নেতা উমাইয়া ইবনু খালাফ-এর কৃষ্ণাঙ্গ দাস বিলাল ইবনু রাবাহ। মনিব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দাসের শাস্তি নিশ্চিত করছে।

দৃশ্যপট : এক

উমাইয়া ব্যথায়-কষ্টে ছটফট করতে থাকা বিলালকে লোভ দেখাচ্ছে : মাত্র একবারের জন্য বলো—তোমার রব মিথ্যা, তোমার দ্বীন মিথ্যা, তোমার রাসূল মিথ্যা। আমি তোমার শাস্তি মিটিয়ে দেব।

বিলাল ইবনু রাবাহ প্রতিবার লোভের বিপরীতে সবটুকু শক্তি একত্র করে চিৎকার দিয়ে বলছেন, আহাদুন আহাদ, আহাদুন আহাদ—আমার রব এক, আমার রব এক।

পরবর্তীকালে সাহাবিরা যখন বিলালকে জিজ্ঞেস করলেন, এত কিছু থাকতে আপনি কেন 'আহাদুন আহাদ' স্লোগানটি চিৎকার করে বলতেন?

বিলাল উত্তর দিলেন, কারণ এই স্লোগানটি শুনলেই পাপিষ্ঠ উমাইয়া সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত বোধ করত।

দৃশ্যপট : দুই

আবূ বকর সিদ্দীক ছুটে এলেন বিলালকে উমাইয়ার কাছ থেকে কিনে নিয়ে অসহ্য কষ্টের ইতি টানতে। উমাইয়া ইচ্ছে করে দাম বাড়িয়ে হাঁকাল :

– ৪০ উকিয়া স্বর্ণ হচ্ছে বিলালের দাম।

– আচ্ছা, আমি কিনে নিলাম।

– হে আবূ বকর! তুমি যদি রাজি না হতে, তবে আমি এই দামের অর্ধেকেই (২০ উকিয়া) বিলালকে বিক্রি করে দিতাম।

– হে উমাইয়া! তুমি যদি রাজি না হতে, তবে আমি এর দ্বিগুণ দাম (৮০ উকিয়া) দিয়ে হলেও বিলালকে কিনে নিতাম।

দৃশ্যপট : তিন

আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু উমাইয়ার কাছ থেকে কিনে নিয়ে পর-মুহূর্তেই উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখে বিলাল রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বুকে টেনে নিয়ে ঘোষণা দিলেন : বিলালকে আমি মুক্তি দিলাম। সে আমাদের ভাই।

****

এগুলো রূপকথা নয়, এগুলো ফিকশন-ফ্যান্টাসি নয়, হে বন্ধু আমার!

রদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।

৩

ছোট্ট বাচ্চাটি গুটিসুটি করে মিশে আছে মা'র কোলে। পারলে মিশে যায় কিংবা বুকের ভিতরে ঢুকে যায় যেন! পায়ের দগদগে ক্ষত মনে করিয়ে দেয় নিকট-অতীতেই হয়তো পুড়ে গেছে কোথাও।

– মা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

– এই তো মা, ওপারে!

– ওরা কি মারবে না মা?

– না মা, ওরা তোমার ভাই!

– আমাদের শরীরে আগুন দেবে না তো?

– না-রে মা! ওরা তোর বাবার মতো। তোকে আদর করবে। আর খেলতে যখন ইচ্ছে হবে তোর, ঘুরতে নিয়ে যাবে ওই দূর মাঠে।

গতরাত থেকে এত ঝড়-ঝাপটা গিয়েছে যে কিছুই মনে ছিল না বাচ্চাটির। হঠাৎ তার বাবার কথা মনে হল যেন।

– মা গো! বাবা কোথায় আমার? দুদিন ধরে দেখি না কেন বাবাকে?

অশ্রু জমে ওঠে মায়ের চোখে। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কপালে এঁকে দেয় আলতো চুমু—তোর বাবা নতুন বাড়ি ঠিক করতে গেছে মা।

মা ঠিক জানে, মেয়ের বাবা আর ফিরবে না কখনও। দুদিন আগেই চলে গেছে না ফেরার দেশে। তার শেষ কথা ছিল, বাঁচতে চাইলে আমার মেয়েকে নিয়ে পালাও।

৭টি নৌকা এগিয়ে চলেছে সন্তর্পণে। নাফ নদীর বুক চিরে। ওই তো বাংলাদেশ!

হঠাৎ কীসের যেন শোরগোল। বিজিবি ঘিরে ধরেছে নৌকা। ঢুকতে দেওয়া যাবে না এদের। পুশব্যাক করাতে হবে। ওপরের নির্দেশ।

এদিকে অভুক্ত, অসহায় নৌকার যাত্রীরা উৎকণ্ঠিত। ফিরিয়ে দেবে না তো?

ইতিমধ্যে নৌকার বুকে গুঞ্জন শোরগোলের রূপ নিয়েছে।

'আমাদের বাঁচতে দিন।'

'আপনারা তাড়িয়ে দিলে আল্লাহর দুনিয়ায় আমাদের কোনো স্থান থাকবে না হয়তো।'

এক বৃদ্ধাকে হাউমাউ করে কাঁদতে দেখা গেল। এগিয়ে এলেন সেই মা। শুকিয়ে যাওয়া চোখে টলমল করছে অশ্রু, আমরা ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু দয়া করা আমার বাচ্চাটিকে নিয়ে যান। ওকে বাঁচতে দিন।

বিনিময়ে নির্মম, কঠোর চাহনি ফিরে পেলেন মা। কোলে তার সেঁটে-যাওয়া ভীরু সন্তান। নৌকা চলল ফের আরাকানের দিকে।

'মা গো! আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

মা নীরব।

'ওরা কি আমার ভাই নয়? তুমি না বললে ওরা আমার বাবার মতো!'

মায়ের চোখে নিথর দৃষ্টি। চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'তোর ভাইয়েরা মরে গেছে। পৃথিবীর কোথাও তোর ভাই নেই।'

'বাবার নতুন বাড়ির কি হবে মা?'

'আমরা সেই বাড়িতেই যাচ্ছি মা। তোর বাবার কাছে!'

টপটপ করে ঝরে পড়ছে অশ্রুমালা।

****

মায়ের এ অশ্রু শুকোবার নয়!

আরাকানের পাহাড়-ধরে-নেমে-আসা নাফ-এ কি কেবলই নদীর জল বইছে?

নাকি কারও অশ্রুজলও মিশেছে?

কিংবা রক্ত?

আমাদের রক্ত?

৪

কোনো এক যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু-এর একজন ক্রীতদাস পালিয়ে রোমের মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রদিয়াল্লাহু আনহু সেই ক্রীতদাসটিকে ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু-কে ফেরত দিয়ে যান। আরেকবার আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি ঘোড়া ছুটে গিয়ে রোমানদের মধ্যে পৌঁছে যায়। এরপর সেই এলাকা মুসলমানদের দখলে আসলে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রদিয়াল্লাহু আনহু হারানো-ঘোড়াটি ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু-কে ফেরত দিয়ে যান।[৮২]

একজন ক্রীতদাস কিংবা সামান্য একটি ঘোড়া শত্রুদের দখলে চলে যাওয়ার পর সেটি পুনরায় নিজেদের দখলে না নিয়ে আসা পর্যন্ত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো বীর সেনাপতিরা স্থির হতেন না। শত্রুদের হাতে চলে যাওয়া সামান্য ঘোড়াটি পর্যন্ত জয় করে মুসলিম মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে তবেই শান্ত হতেন তাঁরা।

আল্লাহু আকবর!

অথচ আজকে এলাকার-পর-এলাকা কুফফারের-মুশরিকদের দখলে চলে যায়। দেশের-পর-দেশ উম্মাহর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে কুফফার। হত্যা-বন্দি করা হচ্ছে ভাইদের। নির্যাতিত হচ্ছেন মা-বোনেরা। ক্ষুধার কষ্টে গাছের পাতা সেদ্ধ করে খাচ্ছে ইয়াতীম-অবুঝ শিশুরা।

আর উম্মাহর তথাকথিত নেতারা প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের বিভিন্ন অবকাশ-যাপন-কেন্দ্রে আনন্দ-ফুর্তির তুবড়ি ফোটাচ্ছেন!

আফসোস; খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ-রা এই আমাদের পূর্বসূরি।

আফসোস; আমরা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদদের উত্তরসূরি।

[৮২] বুখারি, ২৭৪

'সুন্নাতাল্লাহ'

নিউটনের সূত্র, আর্কিমিডিসের সূত্র, গ্যালিলিও-র সূত্র, আইনস্টাইনের সূত্র, এ-জাতীয় সকল সূত্র মুখস্থ, ঠোঁটস্থ ও কণ্ঠস্থ আমাদের। বেশ ভালো। মহান আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ রীতি বা সূত্র সম্পর্কে জানা আছে কি আমাদের?

এই সূত্রকে 'উম্মাহর প্রতিস্থাপন সূত্র' বলা যেতে পারে।

একটু বিস্তারিত বলার চেষ্টা করি।

আমাদের মধ্যে কেউ ৩০/৪০/৫০ বছর দ্বীনের পথে থাকলেই যে দ্বীনের ওপরেই তার/তাদের মৃত্যু হবে, এমন ভরসার কোনো কারণ নেই। একইভাবে অতীত বিচার করে কোনো ব্যক্তি/ব্যক্তিদের চিরকালের জন্য (Guaranteed – Rightly Guided) দ্বীনদার ভাবারও সুযোগ নেই। প্রকাশ্য শত্রু শয়তান ও তার বাহিনী মু'মিনদের মৃত্যুর গড়গড়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করার চেষ্টায় সদা-তৎপর থাকবে।

আমাদের মধ্যকার কেউ/কারা যদি দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, মহান আল্লাহ তাদের স্থানে আরেকটি দল তৈরি করে দেন। এই নতুন সৃষ্ট বা প্রতিস্থাপিত দলটির ৬ টি বিশেষত্বের কথা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সুরা আল-মায়িদাহ'র ৫৪ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন :

> "হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই মহান আল্লাহ (তাদের স্থানে/তাদের পরিবর্তে) এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি

করবেন, যাদেরকে,

১) তিনি (মহান আল্লাহ) ভালোবাসবেন।

২) তারা তাঁকে (মহান আল্লাহকে) ভালোবাসবে।

৩) তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী হবে।

৪) তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।

৫) তারা মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং

৬) কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।

এটি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। মহান আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।"

একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বললে, এই ৬ টি বিশেষত্ব যখনই কোনো ব্যক্তিদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাবে বা লোপ পাবে, তাদেরকেই মহান আল্লাহ নতুন ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করবেন। এমন সব মানুষ যাদের মধ্যে থাকবে ওপরের ৬টি বিশেষত্ব।

আমরা বিশ্বাস করি, মুসলিম হয়ে দ্বীন ইসলামের কোনো গৌরব আমরা বৃদ্ধি করিনি। বরং দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে এর মাধ্যমে নিজেরা গৌরবান্বিত হয়েছি।

একইভাবে, আমরা মহান আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করতে পেরে সফল (ইন শা আল্লাহ) হতে পেরেছি। আমাদের দাসত্ব স্বীকারে প্রবল পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর বড়োত্বের কোনো হেরফের হয় না। পুরো পৃথিবীর সবার অবাধ্যতায়ও তাঁর মহত্ত্বের কোনো কমতি হবে না। কারণ আমরা মহান আল্লাহর গলগ্রহ; মহান আল্লাহ সবকিছুর অমুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।

ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে এতদিনের মুখস্থ-ঠোঁটস্থ সূত্র কালকে বাদে পরশুদিন ভুল প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলার সূত্র বা 'সুনাতাল্লাহ' কস্মিনকালেও ভুল প্রমাণিত হবে না, মনে রাখা চাই।

নিপাতনে সিদ্ধ

১

এই উম্মাহর একটি বড়ো অংশ একিউট কন্সপিরেসি সিনড্রোম (Acute Conspiracy Syndrome)-এ ভুগছে।

এর ন্যূনতম উপসর্গ হলো, সবকিছুর মধ্যে একটা কন্সপিরেসি বা ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা।

বুখারি ও মুসলিম শরীফের বাইরে যে সহীহ এবং হাসান হাদীস আছে, এটি যেমন তারা (সিনড্রোমে-ভোগা) মানতে চান না, তেমনি উসমান ইবনু আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু এক রাকআতে কুরআন খতম করতেন এটিও তারা মেনে নিতে চান না। পরিষ্কার 'ইহুদিবাদী' গন্ধ খুঁজে পান সেখানে।

একইভাবে কারামত-জাতীয় কোনো কিছু শুনলেই শ্রেফ মিথ্যা ট্যাগ দিয়ে দেন তারা। সেটি সাত শ শতকের আবূ মুসলিম খাওলানি রহিমাহুল্লাহ-এর কোনো ঘটনা হোক, কিংবা বিংশ শতকের ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ হোক। উম্মাহর জন্য কল্যাণকর এবং আনন্দদায়ক কোনো সংবাদে প্রথমেই 'জায়নিস্ট ইন্ধন-রন্ধনের গন্ধ' খুঁজে বের করেন তারা।

দ্বীনের বিষয়ে কোনো কিছু যাচাই করে নেওয়া অবশ্যই উত্তম। কিন্তু অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে হওয়া থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন মনে করি আমি।

মহান আল্লাহ উত্তম জানেন, যদি মাহদী আলাইহিস সালাম কাল ভোরে আবির্ভূত

হন উদাহরণ, তা হলে একিউট কন্সপিরেস-সিনড্রোম (Acute Conspiracy Syndrome) এ ভুগতে-থাকার কারণে উনি কি সহীহ মুসলিম? নাকি ইহুদিদের পেইড এজেন্ট?

এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বেই পেছনে পড়ে যাব আমরা!

আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা হবে সেটি।

আল্লাহুল মুসতাআন।

২

জীবন কী?

আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।"[৮৩]

অনেকের কাছে জীবনের অর্থ হলো '৮ ফুট x ৮' ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থের একটি রুম। টিমটিমে হলুদ আলোয় ২৪ ঘণ্টার অধিকাংশ সময় জিজ্ঞাসাবাদের নামে অমানুষিক টর্চার।

সুবহানাল্লাহ; নিষ্ঠুর, নৃশংস সেই টর্চার তাদের ঈমানের ভিত্তিকে শুধু মজবুতই করে চলেছে; ইঞ্চিমাত্র নড়াতেও পারেনি।

রমাদানের এই শেষ দশকের মুবারক সময়ে পৃথিবী-জুড়ে কুফফার, মুশরিক ও তাগুতের কারাগারে নির্যাতিত-নিপীড়িত দ্বীনি ভাই-বোনদের আমাদের দুআতে স্মরণ করতে যেন ভুলে না যাই আমরা। এইটুকু তো আমাদের ওপর তাদের ন্যূনতম দাবি।

হে মহান আল্লাহ! আপনি কারাগারের অভ্যন্তরে নির্যাতিত মুসলিম ভাই-বোনদের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। তাদের মনে প্রশান্তি দান করুন।

তাদের এই ত্যাগের বিনিময়ে উভয় জীবনে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

৩

কী অদ্ভুত বিষয়!

[৮৩] মুসলিম, ২৯৫৬; তিরমিযি, ২৩২৪; ইবনু মাজাহ, ৪১১৩, আহমাদ, ৮০৯০, ২৭৪৯১, ৯৯১৬

দ্বীনের বুনিয়াদী ও প্রাথমিক বিষয় নিয়ে কিছু মানুষের লেকচারগুলো ইউটিউব-ফেইসবুক কর্তৃপক্ষ ডিলিট করে দিচ্ছে; একটির-পর-একটি।

অন্যদিকে কিছু লোকের ফেইসবুক একাউন্ট ভেরিফাইড হচ্ছে। নীল ব্যাজ শোভা পাচ্ছে প্রোফাইলে। ইউটিউব চ্যানেলের সাবসক্রাইবার লাখের-পর-লাখ বেড়ে চলেছে। অথচ তাদের কোনো একটি ভিডিও কর্তৃপক্ষ কখনও ডিলিট করেছে বলে আমাদের জানা নেই!

সোজা-কথায়, পশ্চিমা মিডিয়া কিছু শাইখদের ওপর সন্তুষ্ট।

সমস্যাটি কোথায়?

আল্লাহ তাআলা কুরআনে সূরা আল-বাকারাহ'র ১২০ নাম্বার আয়াতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলছেন, "ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।..."

৪

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কিছুতেই কুরাইশ কাফেলাকে আক্রমণ করবেন না; তা হলে তারা এটাকে অজুহাত বানিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করবে!

হে আল্লাহর রাসূল! আরব উপদ্বীপের কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না, তা হলে তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনার বিরুদ্ধে আক্রমণ করবে!

হে আল্লাহর রাসূল! রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে আপনি সৈন্য সমাবেশ ঘটাবেন না। তা হলে রোমকরা আপনার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটালে আপনি তার সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারবেন না! আপনার উচিত তাদেরকে আলাপ আলোচনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা, কলম ও জিহ্বার দ্বারা যুদ্ধ করা, কিছুতেই তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা উচিত নয়।

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি উসামা বিন যায়েদের বাহিনীকে রোমকদের জন্য প্রেরণ করবেন না!

হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা আবূ বকর! আপনি উসামা বিন যায়েদের বাহিনীকে থামান, আমরা রোমানদের সামনে কিছুই নই। কোথায় রোম সাম্রাজ্য আর কোথায় আমরা!

হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা আবূ বকর! আরবরা মুরতাদ[৮৪] হয়ে গেলেও আপনার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত নয়। আপনার উচিত মদীনায় থাকা। তাদেরকে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নম্রতার সাথে দাওয়াত দেওয়া। কেননা আমাদের অবস্থা এখন দুর্বল; তারা শুধু যাকাত দেয় না, তাতে কী হয়েছে? তারা তো এখনও কালিমার স্বীকৃতি দেয়, সালাত আদায় করে!

হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা আবূ বকর! বিশ্বের পরাশক্তির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া আপনার কিছুতেই উচিত নয়। কারণ তাদের সাথে টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই! বরং আপনার উচিত আলাপ আলোচনা, সেমিনার সিম্পজিয়াম প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি উপায়ে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া।"

****

আহ! আমরা কতই-না অন্ধ!!

আজকাল কিছু কিছু মুসলিমদের আচরণ দেখলে মনে হয় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময় থাকলে এ মানুষগুলো অনেকটা ওপরের কথাগুলোর মতো অবস্থান গ্রহণ করত!

৫

নিজের খেয়ালখুশি, সমাজ কিংবা যুগের সুপার পাওয়ারের অন্ধ অনুসরণ না করে যথাযথভাবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ইসলাম পালনের চেষ্টা করা ভাই-বোনদেরকে 'ছাগু-হুজুর-কাঠমোল্লা-জঙ্গী-HOJOR-হিজাবি-NINJA' ইত্যাদি বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়।

ওয়াল্লাহি! আমাদের অনেককে প্রায়শই এমন কথা শুনতে হয় আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী, সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। চোখের টিপ্পনী, ঠোঁটের কোনায় বিদ্রুপের হাসি, প্রকাশ্য অবহেলা সহ্য করতে হয় অনেককে। সত্যি বলতে কিছু সময় সবর করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষাগুলো সহজ করুক আমাদের জন্য।

হে মুসলিম ভাইবোনেরা! কুরআনুল কারীমের সূরা আল-মুতাফফিফীন এর ২৯ থেকে

[৮৪] ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলে তাদের মুরতাদ বলা হয়।

৩৬ নাম্বার আয়াত গেঁথে ফেলুন মনের ভেতর; বিইযনিল্লাহ।

"নিশ্চয়ই যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত (দুনিয়ার জীবনে)। এবং তারা (বিশ্বাসীরা) যখন তাদের (অপরাধীদের) কাছ দিয়ে যেত, তখন তারা (অপরাধীরা) পরস্পর চোখ টিপে ইশারা (ঠাট্টা-বিদ্রুপ) করত।

তারা (অপরাধীরা) যখন নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে (বাসায়) ফিরত, তখনও হাসাহাসি (ঠাট্টা-বিদ্রুপ) করে ফিরত। আর যখন তারা (অপরাধীরা) বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত—নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট। অথচ তারা (অপরাধীরা) বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরিত হয়নি।

আজ (কিয়ামাতের দিন) যারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করছে। (উঁচু) সিংহাসনে বসে, তাদেরকে দেখছে।

কাফিররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?"

অনুসরণীয় পথিকৃৎ

ইযযাহ

খুবাইব ইবনু আদী রদিয়াল্লাহু আনহু-কে যখন শত্রুরা বন্দি করল, যখন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চাইল, তিনি বলেছিলেন, আমাকে দুই রাকআত সালাত আদায় করতে দাও। তিনি উঠে দুই রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন। সেই রাকআত সালাতেও ইযযাহর (মর্যাদার) ছাপ ছিল, তিনি বলেছিলেন, 'শোনো, যদি-না তোমরা আমাকে মৃত্যু ভয়ে ভীত হবার অপবাদ দিতে, আমি এই দু রাকআত সালাত আরও দীর্ঘ করতাম।' তারা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, তোমার কি ইচ্ছে হয় না যে আজকে তোমাদের জায়গায় মুহাম্মাদ থাকত, আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সাথে নিরাপদে থাকতে? তিনি বলেছিলেন, 'না, আল্লাহর কসম! আমরা মরতে রাজি আছি, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের গায়ে মদীনার একটি কাঁটা বিঁধতে দিতেও রাজি নই। আমরা পরিবার-পরিজন নিয়ে নিরাপদে থাকব, আর আল্লাহর রাসূলের গায়ে একটা টোকা লাগবে, তা হতে দেব না।'

এটাই ইযযাহ!

এরপর যখন তারা বৃষ্টির মতো তার দিকে বর্ষা এবং ধনুক ছুড়তে শুরু করল, খুবাইব রদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ! এই কষ্টের জন্য আমি কেবল তোমার কাছেই অভিযোগ করি, তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে—যা তারা আমার প্রতি করেছে। হে আল্লাহ! আরশের মালিক, তারা আমার সাথে যা করার পরিকল্পনা করে তাতে আমাকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দাও। আমি সবার ব্যাপারে হতাশ হলেও তোমার

ব্যাপারে কখনোই হতাশ হই না। সবকিছু তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তিনি চাইলে আমার টুকরো টুকরো করা শরীরকেও বরকতময় করে দিতে পারেন। হে আল্লাহ! তারা আমাকে বলেছিল হয় মৃত্যু নয়তো কুফরিকে বেছে নাও। আমি বরং মৃত্যুকে বেছে নিলাম। হে আল্লাহ! আমার এই চোখের অশ্রু তাদের ভয়ে নয়, এই অশ্রু বরং তোমার জন্য! আমি যদি মুসলিম হিসেবে মারা যাই তা হলে আর কিছুতেই আমার কিছু যায় আসে না। হে আল্লাহ! আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আমি ভয় করি জাহান্নামকে! শত্রুদের সামনে আমি কখনও নতজানু হব না, হব কেবল আল্লাহর কাছে, যার কাছে আমি ফিরে যাব।"[৮৫]

আনুগত্য : একটি উদাহরণ

বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের-সহ মূলত আবূ সুফইয়ানের বাণিজ্য-কাফেলা আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ঘটনাপ্রবাহ তা বদরের যুদ্ধের দিকে মোড় নেয়। বদর প্রান্তরে চূড়ান্তভাবে ঘাঁটি স্থাপনের আগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। মদীনার আনসার সাহাবিদের তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথের মধ্যে এই শর্ত ছিল না যে, তাঁরা মদীনার বাইরেও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যুদ্ধে সহায়তা করবেন। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে তাঁরাই অধিক। সেই কারণেই মতবিনিময় সভা।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মতামত চাইলে আবূ বকর ও উমার রদিয়াল্লাহু আনহুম সর্বাবস্থায় তাঁর সাথে থাকার ওয়াদা পুনরায় ব্যক্ত করেন। আরেক মুহাজির সাহাবি মিকদাদ বিন আমর রদিয়াল্লাহু আনহু চমৎকার একটি কথা বলেছিলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে পথে চলার কথা বলেছেন, আপনি সেই পথে চলতে থাকুন। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনোই আপনাকে সেই কথা বলব না যা বানী ইসরাঈল মূসা আলাইহিস সালাম-কে বলেছিল—'আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।'[৮৬] বরং আমরা বলব, আপনি ও আপনার পালনকর্তা যুদ্ধ করুন, আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সাথে আছি।"

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনজনের জন্যই মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করলেন। কিন্তু তিনি মূলত আনসার সাহাবিদের মনোভাব জানতে চাচ্ছিলেন। বিষয়টি অনুধাবন করার পর অন্যতম আনসার নেতা সাদ বিন মুআজ রদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো ঈমান এনেছি, সাক্ষ্য দিয়েছি আপনার

[৮৫] বুখারি, ৩৯৮৯
[৮৬] সূরা আল-মায়িদাহ, ০৫ : ২৪

আনীত রিসালাতের বিষয়ে, সেগুলো মেনে চলার পরে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। অতএব, আপনি যা ইচ্ছা করছেন তা পূর্ণ করার জন্য সামনে এগিয়ে চলুন।

শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য-সহ প্রেরণ করেছেন! আপনি যদি বাহিনী বারকে গীমাদ পর্যন্ত নিয়ে যান, আমাদেরকে আপনার সাথে পাবেন। আপনি আদেশ করলে আমরা উত্তাল সাগরের বিক্ষুব্ধ বুকেও ঝাঁপ দিতে পারি। পৃথিবীর দুর্গমতম জায়গাকেও পায়ের নিচে পিষে ফেলতে পারি ইন শা আল্লাহ।

আমাদের (আনসারদের) একজন সদস্যও পিছে থাকবে না। আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ করবেন সাহসী ও নির্ভীক ভূমিকায়। সম্ভবত মহান আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাদের মধ্য দিয়ে এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ শীতল হবে। সুতরাং, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নিয়ে চলুন আমাদের। মহান আল্লাহ তাআলা যাবতীয় কর্মকাণ্ডে বারাকাহ প্রদান করুক।"

সাদ বিন মুআজ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর অসীম সাহসিকতাপূর্ণ এই বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি আনন্দচিত্তে বললেন,

> "চলো এবং আনন্দিত-মনে চলো। মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে দুটি দলের একটি (বিজয়ী কিংবা শহীদ) সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহর শপথ! আমি যেন এ সময়ে কাফির সম্প্রদায়ের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি!"[৮৭]

ফলাফল : এক-তৃতীয়াংশ জনবল নিয়েও মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিম বাহিনীর নিরঙ্কুশ বিজয়!

পুনশ্চ :

১. সাদ বিন মুআজ রদিয়াল্লাহু আনহু হলেন সেই সাহাবি যাঁর জানাযাতে ৭০ হাজার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

২. সাদ বিন মুআজ রদিয়াল্লাহু আনহু হলেন সেই সাহাবি যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহ তাআলার আরশ কেঁপে উঠেছিল।[৮৮]

৩. সাদ বিন মুআজ রদিয়াল্লাহু আনহু হলেন সেই সাহাবি যাঁর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

[৮৭] মুসলিম, ২৮৭৪
[৮৮] বুখারি, ৩৮০৩

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটা বলেছেন, "কবরের চাপ থেকে কেউ রেহাই পেলে, সাদ রেহাই পেত।"[৮৯]

৪. সাদ বিন মুআজ রদিয়াল্লাহু আনহু হলেন সেই সাহাবি, বনু কুরাইজার বিষয়ে যাঁর সিদ্ধান্তের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকটা এমন বলেছেন, "তুমি আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী সিধান্ত দিয়েছো।"[৯০]

উসাইরিম!

উহুদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

সাহাবিরা রক্তাক্ত-প্রান্তর ঘুরে ঘুরে আহত এবং শহীদ মুসলিমদের দেহ উদ্ধার করে চলেছেন। এই প্রান্তরেই সাহাবিরা এমন একজন ব্যক্তিকে গুরুতর আহত অবস্থায় পেলেন যাঁর কিনা যুদ্ধক্ষেত্রেই যাবার কথা ছিল না। কারণ সেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন!

তাঁর নাম উসাইরিম আমর ইবনু সাবিত ইবনু ওয়াকাশ রদিয়াল্লাহু আনহু। বানু আবদুল আশহাল গোত্রের এই ব্যক্তি উহুদের যুদ্ধের দিন সকাল পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। সেই মুমূর্ষু অবস্থায় বানু আবদুল আশহালের সাহাবিরা তাঁকে খুঁজে পেয়ে নিজেরা বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। হযরত উসাইরিম রদিয়াল্লাহু আনহু-কে সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমর! আপনি তো ইসলামকে অস্বীকার করতেন। আপনি কী কারণে এখানে লড়াই করতে এলেন?

উসাইরিম রদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে জানালেন, আমি ইসলামের আকর্ষণে ছুটে এসেছি। মহান আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আমি ঈমান এনেছি এবং মুসলমান হয়েছি। তারপর তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসেছি এবং কাফিরদের সাথে লড়াই করে আহত হয়েছি। তার পরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা।"

উহুদের রক্তাক্ত বুকে এর কিছুক্ষণ পরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন উসাইরিম আমর ইবনু সাবিত রদিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সব ঘটনা শুনে বললেন, 'هو من اهل الجنة'

সে (উসাইরিম) জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

---

[৮৯] আহমাদ, ৬/৫৫, ৯৮; সহীহ।
[৯০] বুখারি, ৪১২১

আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "তিনি (উসাইরিম) জান্নাতবাসী, অথচ তিনি এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেননি (সালাত আদায় করতে পারেননি; সালাতের ওয়াক্তের পূর্বেই তিনি শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন)।"[৯১]

রদিয়াল্লাহু আনহু। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি!

জান্নাতের সবুজ পাখী

কোনো সাহাবির প্রতি বিশেষ দুর্বলতা থাকা মহান আল্লাহর কাছে দূষণীয় কি না, জানা নেই আমার। তবে ৪ ন্যায়নিষ্ঠ খলীফার পরে কোনো সাহাবির কথা মনে করতে বললে কেন জানি তাঁর কথাই সবার আগে মনে হয় আমার। নিজের অজান্তে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

সত্যিকার অর্থেই সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলেন মানুষটি। তিনি হেঁটে চলে যাবার পরেও দীর্ঘক্ষণ সুগন্ধ ভেসে বেড়াত বাতাসে। অত্যন্ত ধনী বাবা-মা'র সন্তান হিসেবে ভীষণ আদর-যত্নে, বিপুল প্রাচুর্য আর বিলাসিতার মধ্য দিয়ে শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটিয়েছেন তিনি। পুরো আরব অঞ্চলের সবার চেয়ে দামি জামা পরতেন। ইয়েমেনি পশমি, বাহারি জুতা থাকত তাঁর পায়ে।

তাঁর নাম মুসআব ইবনু উমাইর রদিয়াল্লাহু আনহু।

অত্যন্ত সুদর্শন ও সুপুরুষ মানুষটি শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণনতার জন্যও ছিলেন তৎকালীন কুরাইশ গোত্রের মধ্যে বিখ্যাত একজন। বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও 'দারুন-নাদওয়া' থেকে শুরু করে কুরাইশদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও সমাবেশে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল।

আর প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই তরুণই ইসলামের একদম শুরুর দিকে অত্যন্ত গোপনে দারুল আরকামে হাজির হয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। 'দারুল আরকাম' বা 'আরকামের গৃহ' হলো সেই বিখ্যাত বাড়ি, যেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে দ্বীন ইসলাম প্রচার করছিলেন এবং মিলিত হচ্ছিলেন তাঁর কল্যাণপ্রাপ্ত সাহাবিদের সাথে।

মুসআব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর মা খুনাইস বিনতু মালিক ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ় মনোবলের অধীকারী, সম্ভ্রান্ত বংশীয় আরব-মহিলা। ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁর মা কঠোর শাস্তি দিলেন তাঁকে। মক্কার সমস্ত যায়গা থেকে তিনি পদচ্যুত হলেন, অন্যান্য

---

[৯১] আর-রাহীকুল মাখতুম, ৩২১-৩২২; ইবনু হিশাম, ০২/৯০; যাদুল মাআদ, ০২/৯৪

মুসলিমদের মতো কঠিন অত্যাচার নেমে আসে তাঁর ওপর। কিন্তু মা-ভক্ত মুসআব যে মহান আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলকে সবচেয়ে উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন।

মা আর সন্তানের বিচ্ছেদ একসময় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল যদিও দুজন দুজনকে ভীষণ ভালোবাসত। মা-পুত্র দুজনই এই পরিণতি মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু এর মাধ্যমে ঈমানের ওপর মুসআবের এবং কুফরের ওপর খুনাইসের অটল দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। খুনাইস সন্তান মুসআবের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মুসআব পরিবারের বিশাল ঐশ্বর্য আর বিত্তের উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত হলেন। ঘর ছাড়লেন মুসআব। পেছনে ফেলে এলেন বিপুল ঐশ্বর্য আর বিলাসিতার জীবন।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসআবকে অত্যন্ত ভলোবাসতেন। মক্কার মুসলমানদের হিজরতের আগে মদীনার মুসলমানদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একজন শিক্ষক চাওয়া হলো। ইসলামের অত্যন্ত উন্নত ও দৃঢ় চরিত্র, উত্তম ব্যবহার, কুরআনের ওপর অগাধ জ্ঞান এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তার জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজের জন্য নির্বাচিত করলেন মুসআব ইবনু উমাইর রদিয়াল্লাহু আনহু-কে। তাঁর হাত ধরেই মদীনার আল-আওস গোত্রের প্রধান সাদ ইবনু মুআজ রদিয়াল্লাহু আনহু এবং আল-খাযরাজ গোত্রের প্রধান সাদ ইবনু উবাদা রদিয়াল্লাহু আনহু দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেন।

উহুদ যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলে দিলেন মুসআবের হাতে। এ ছিল সমগ্র সাহাবি-সমাজে অত্যন্ত বিরল সম্মান এবং গর্বের বিষয়। এই যুদ্ধেই শাহাদাতের অমৃত পান করে 'জান্নাতের সবুজ পাখী' হলেন মুসআব ইবনু উমাইর রদিয়াল্লাহু আনহু।

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধ-ময়দান ঘুরে ঘুরে শহীদ মুসলিমদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এবং তাদের জানাযার আয়োজন করছিলেন। এক সময় ঘুরতে ঘুরতে তিনি প্রিয় মুসআবের কাছে এলেন।

বিপুল প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে বড়ো হওয়া মুসআবের রক্তাক্ত শরীর পড়ে আছে উহুদের মরু প্রান্তরে। তাঁর দেহকে ঢেকে দেবার জন্য একখণ্ড কাপড় চাওয়া হলেও একমাত্র তার পোশাকটি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। যে জামাটি তাঁর ছিল সেটি দিয়ে তাঁর পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়ছিল এবং মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে পড়ছিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "জামাটি দিয়ে মুসআবের মাথা ঢেকে দাও এবং পা ইজখির (এক প্রকার ঘাস) দিয়ে ঢেকে দাও।"[৯২]

[৯২] বুখারি, ৪০৮২

মুসআবের দেহের সামনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বললেন, "এ মুসআবকে আমি মক্কায় তার বাবা-মা'র সাথে দেখেছি। তাঁরা ওকে খুব যত্ন করতেন। কুরাইশদের মধ্যে কোনো যুবকই তার মতো ছিল না। এরপর মুসআব সমস্ত কিছু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করে এসেছে এবং নিজেকে সে রাসূলের কাজে নিবেদিত করেছে।"[৯৩]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এই অবস্থায় তিনি পবিত্র কুরআনের সেই অনন্য-সাধারণ আয়াত পড়লেন মুসআবের জন্য—

> "ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখাল। তাদের কেউ নিজের নজরানা পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার প্রতীক্ষায় আছে। তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করেনি।"[৯৪]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর অশ্রুসিক্ত চোখে যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকে মুসআব এবং তার অন্য শহীদ সাথিদের লক্ষ্য করে বললেন, "আমি কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য সাক্ষী হব।"[৯৫]

মহান আল্লাহ যদি আমার অজস্র পাপ ক্ষমা করে তাঁর অসীম অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করান আমাকে, তবে মুসআব ইবনু উমাইর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে কিছুটা সময় একান্তে কাটানোর দারুণ এক স্বপ্ন দেখি আমি। সাথে বেশ কয়জন দ্বীনি ভাইকেও পাশে চাইব ইন শা আল্লাহ!

---

[৯৩] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/১০৮
[৯৪] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ২৩
[৯৫] বুখারি, ১৩৪৩

আত্মসমালোচনা অনুচ্ছেদ

১

মাদীনা আল-মুনাওয়ারা,

মাসজিদ আন-নববি।

আমিরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবিদের মধ্যে বসে আছেন। হঠাৎ করেই উঠে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়ালেন তিনি। উপস্থিত সাহাবিরা নড়েচড়ে বসলেন।

উমার বললেন, "আমার কয়েকজন খালা-ফুফু ছিলেন। আমি তাদের ছাগল-মেষগুলো উপত্যকায় চরাতে নিয়ে যেতাম। দিন শেষে যখন পশুগুলোকে তাদের বাড়িতে দিয়ে আসতে যেতাম, তারা আমাকে অল্প কিছু খেজুর-কিসমিস দিতেন। বড়ো কষ্টে কাটত আমার সেইসব দিনরাত্রি!"

এইটুকু বলেই উমার রদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বর থেকে নেমে এসে নিচে বসে রইলেন।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিদের একজন আবদুর রাহমান ইবনু আউফ রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, কেন বললেন এই পুরোনো কথাগুলো? আপনি তো শুধু শুধু নিজেকে ছোটো করলেন সবার সামনে!"

অর্ধ-পৃথিবীর ক্ষমতা যেই খলীফার হাতে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যতম সহচর, সেই উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "হে আউফের পুত্র! আমার নাফস আমাকে বলছিল যে, তুমি তো এখন আমিরুল মুমিনীন। কে তোমার চেয়ে উত্তম হতে পারে? আমি সে কারণেই নাফসের প্ররোচনার বিরুদ্ধে

নিজেকে শিক্ষা দিতে চেয়েছি এবং নাফসকে বোঝাতে চেয়েছি আসলে আমি কে।"[৯৬]

উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু নিজের নাফসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিদ্রও বন্ধ করার জন্য সর্বদা তৎপর ছিলেন, যেন শয়তান কোনোভাবেই প্রবেশ করতে না পারে। আর আমরা, বর্তমান উম্মাহ?

ছিদ্র তো আছেই অসংখ্য; তার ওপরে আমরা নিজেদের নাফসের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছি প্রকাশ্য শত্রু শয়তান প্রবেশের জন্য! কোথায় তাঁদের জীবন-দর্শন-শিক্ষা! আর কোথায় বর্তমান উম্মাহর জীবনব্যবস্থা!

কত কিছুই-না শেখার আছে এই 'আপাত সামান্য' বিষয়গুলোতে!

নিজের নাফসকে আমাদের প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন,

আমরা কে?

কোথা থেকে এসেছি?

কীভাবে ও কোন অবস্থায় এসেছি?

কেন এসেছি?

এবং কোথায় ফিরে যেতে হবে আমাদের?

২

টুইটার-ফেইসবুক তথা ভার্চুয়াল লাইফের লক্ষ ফলোয়ার, একচুয়াল লাইফের লক্ষ ভক্ত-গুণগ্রাহী-ফ্যান, পৃথিবী-জোড়া-খ্যাতি, কিছুই সাথে নিতে পারবেন না। ঠিক যে অবস্থায় এসেছিলেন, সেই অবস্থায় ফেরত যাবেন; সাথিহীন।

> "কিয়ামাতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।"[৯৭]

আজ হাজার হাজার মানুষ আপনার কথা শুনে। অথচ সেদিন আপনার নিজের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যন্ত আপনার কথা শুনবে না।

> "তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।"[৯৮]

---

[৯৬] ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩/২৭৩
[৯৭] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৫
[৯৮] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ২০

আজ হয়তো ভাবছেন, এই কাজটি এমনভাবে না করলে মানুষ কী ভাববে আমার সম্পর্কে? এই বিষয়ে এইভাবে কথা না বললে সমাজ কী মনে করবে আমাকে!

সেদিন মনে হবে নিশ্চিত, আহ; আমি যদি 'মহান আল্লাহ কী ভাববেন', শুধু এই একটি বিষয় মনে রাখতাম! আফসোস, আমি যদি উত্তম কথা বলতাম! ধিক, আমি নেহায়েত চুপ থাকতামও বা যদি!

> "যে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?"[৯৯]

আপনার সেদিন নিশ্চিত মনে পড়বে, আপনার আশেপাশের অনেকেই আপনাকে সত্যের পথে-কল্যাণের পথে আহ্বান করেছিল। সেই সত্যকেই আপনি সম্পূর্ণ মিথ্যা-জ্ঞান করেছেন। সেই কল্যাণকেই আপনার কাছে বাড়াবাড়ি কিংবা অসামাজিকতা মনে হয়েছে। সেই আহ্বান মন দিয়ে শোনার ন্যূনতম ইচ্ছেও বোধ করেননি আপনি।

হয়তো নিজেকে আলাদা ভেবেছেন, ভেবেছেন অন্য সবার চাইতে ব্যাতিক্রমী, বিশেষ কিছু, সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত।

কিছু ব্যতিক্রমী সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত মানুষের পরিণতি শুনুন।

> "যাককূম গাছ হবে গোনাগারদের খাদ্য। তেলের তলানির মতো পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলাতে থাকবে যেমন ফুটন্তপানি উথলায়। পাকড়াও করো একে এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যিখানে। তারপর ঢেলে দাও তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব। এখন এর মজা চাখো। তুমি বড় সম্মানী ব্যক্তি কিনা, তাই। এটা সেই জিনিস যার আমার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।"[১০০]

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

যাককূম গাছ দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে, এমন সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত হওয়া থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয়-প্রার্থনা করি।

বুঝবেন একদিন অবশ্যই। ভয় হয় শুধু; ততদিনে নির্ধারিত সময় না শেষ হয়ে যায় আপনার!

> "যারা মনোনিবেশ-সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ

[৯৯] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৩
[১০০] সূরা আদ-দুখান, ৪৪ : ৪৩-৪৯

করে। তাদেরকেই মহান আল্লাহ সৎপথ-প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।"[১০১]

পৃথিবীতে সময়-সুযোগ বুঝে, নিজের বিবেকের সিদ্ধান্তে প্রায়ই নিজের রঙ পরিবর্তন করতেন আপনি। আহা! যদি নিজের দর্শনে অন্ধ না হতেন, তবে দেখতে পেতেন, আপনার আশেপাশের কিছু মানুষদের অন্যরকম কাজ। শুনতে পেতেন তাদের ভিন্নমাপের কিছু কথা।

"আমরা মহান আল্লাহর রঙ গ্রহণ করেছি। মহান আল্লাহর রঙের চাইতে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই ইবাদাত করি।"[১০২]

৩

যতবার-যখনি শাহাদাত উচ্চারণ করি, ততবার-তখনি একটি ভয় জেঁকে বসে অন্তরে।

মুনাফিকের কাতারে চলে গেলাম কি না, সেই ভয়।

সূরা মুনাফিকুন-এর প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

"মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"

মদীনার মুনাফিকরাও আমার মতো শাহাদাত পাঠ করত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে তারা সাক্ষ্য দিত আল্লাহ তাআলার একত্বের। সাক্ষ্য দিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতের বিষয়ে।

অথচ তাদের সাক্ষ্যের বিপরীতে আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, "মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনান নিফাক।

হে আল্লাহ! নিফাক থেকে আপনার কাছে আশ্রয়-প্রার্থনা করছি।

---

[১০১] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ১৮
[১০২] সূরা আল-বাকারাহ, ০২ : ১৩৮

৪

ঘুমাতে যাচ্ছেন জানি; কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন কি নিজের গুনাহের জন্য?

কারণ যত দ্রুত ক্ষমা-প্রার্থনা করা যায়, ততই মঙ্গল! জীবিত অবস্থায় সকল গুনাহের জন্য তাওবাহ করার সৌভাগ্য হলে তো কোনো কথাই নেই; আল-হামদুলিল্লাহ। সাখরাতুল মাওত বা মৃত্যুর কষ্ট থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রতিটি ধাপ মসৃণ হবে ইন শা আল্লাহ। অন্যথায় ভয়ংকর শাস্তির শুরুই হবে সাখরাতুল মাওত থেকে। তারপরে কবরের আযাব!

নিশ্চয়ই সাখরাতুল মাওত থেকে কবরের আযাব বেশি কঠোর। তারপরে ইয়াওমাল কিয়ামাহ বা বিচার-দিবসের কষ্ট। আর সবশেষে জাহান্নামের শাস্তি!

নিশ্চয়ই জাহান্নামের আযাব সর্বনিকৃষ্ট ও কঠোরতম!

তাই নিজেদের গুনাহের থেকে প্রতিদিন তাওবাহ-ইস্তিগফার করতে থাকাই সর্বোত্তম পন্থা। কারণ কখন মালাকুল মাওত তাঁর ফরমান নিয়ে শিয়রে হাজির হবে, কেউ জানি না আমরা।

সাদ্দাদ বিন আওস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা-প্রার্থনা করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

> "হে মহান আল্লাহ! আপনিই আমার প্রভু। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমাকে আপনিই তো সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনারই দাস। এবং আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদা পালন করে যাচ্ছি। আমার মন্দ কাজকর্ম থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ আমি স্বীকার করছি। এবং আমি আমার পাপসমূহও স্বীকার করছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আর নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া তো পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই!"

তিনি বলেছেন, "যে-কেউ ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনের শুরুতে এ কথাগুলো

ঘোষণা করবে, সে যদি সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যায় তবে সে জান্নাতবাসী হবে। আর যে-কেউ ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে রাতের শুরুতে এ কথাগুলো ঘোষণা করবে, সে যদি ভোর হওয়ার আগেই মারা যায়, তবে সে জান্নাতবাসী হবে।"[১০৩]

পাঠকবৃন্দ! এখন কোটি টাকার প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি এতই ব্যস্ত যে, প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ২+২=৪ মিনিট সময় ব্যয় করতে পারব না এই দুআর জন্য?

নিজের সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য?

৫

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সাধারণভাবে মানুষের চরিত্র বর্ণনার সময় কিছু বিশেষণ ব্যবহার করেছেন।

'মানুষ দুর্বলরূপে সৃজিত হয়েছে।"[১০৪]

"নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।"[১০৫]

"মানুষ বড়োই অকৃতজ্ঞ।"[১০৬]

"মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।"[১০৭]

"মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়।"[১০৮]

"সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ।"[১০৯]

"নিশ্চয় মানুষ বড়ো অকৃতজ্ঞ।"[১১০]

"নিশ্চয় সে (মানুষ) অত্যাচারী, অজ্ঞ।"[১১১]

---

[১০৩] বুখারি, ৩১৮, ৩৩৫; নাসাঈ, ৫৫২৪
[১০৪] সূরা আন নিসা, ০৪ : ২৮
[১০৫] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৪
[১০৬] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ৬৭
[১০৭] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ১০০
[১০৮] সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ৫৪
[১০৯] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৩৭
[১১০] সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৬৬
[১১১] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৭২

"মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না।"[১১২]

"বাস্তবিক মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।"[১১৩]

"শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।"[১১৪]

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে।"[১১৫]

"মানুষ কত অকৃতজ্ঞ!"[১১৬]

"সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে।"[১১৭]

"নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।"[১১৮]

"এবং সে (মানুষ) নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত।"[১১৯]

"নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।"[১২০]

তবুও মানুষ অহংকার করে! তবুও মানুষ নিজেকে প্রশংসিত মনে করে! তবুও মানুষ নিজেকে ধনবান, স্বাধীন ও অনির্ভরশীল মনে করে!

"হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর গলগ্রহ। আর আল্লাহ; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"[১২১]

---

[১১২] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪৯
[১১৩] সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩ : ১৫
[১১৪] সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩ : ৩৭
[১১৫] সূরা আল-মাআরিজ, ৭০ : ১৯
[১১৬] সূরা আবাসা, ৮০ : ১৭
[১১৭] সূরা আল-আলাক, ৯৬ : ৬
[১১৮] সূরা আল-আদিয়াত, : ৬
[১১৯] সূরা আল-আদিয়াত, : ৮
[১২০] সূরা আল-আসর, : ২
[১২১] সূরা আল-ফাতির, : ১৫

পরিবর্তিত জাভেদ কায়সার

১

ইনবক্সে প্রশ্ন, "সবকিছুর মধ্যে ধর্ম টেনে আনতে হবে কেন আপনাকে?"

আমি ক্লান্ত গলায় উত্তর দিই, "কারণ আমি মুসলিম। আমার ধর্ম ইসলাম।"

অপর প্রান্ত তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তরের আশায় থাকে। আমার সাদামাটা উত্তর আশাহত করে তাদের। ক্রোধ চেপে গিয়ে পাল্টা প্রশ্নবাণ ছোড়েন,

"আপনার কি মনে হয় আমি মুসলিম না? কই, আমি তো রাজনীতি, খেলা, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ে ধর্ম টেনে আনি না। ইসলামের নাম দিয়ে সবকিছুতে খুঁত ধরা আপনাদের মতো মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে, এটাই সত্য।"

এড়িয়ে যেতে গিয়েও ফিরে আসি আমি। খানিক চিন্তা করে আবার ম্যাসেজ পাঠাই,

– কিয়ামাত বিশ্বাস করেন? পাপ-পুণ্যের হিসাব?

– বিশ্বাস না করার কী আছে? অবশ্যই বিশ্বাস করি। মুসলমান-মাত্রই করে।

– কীসের মাপকাঠিতে সেদিন বিচার হবে আমাদের? আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপি? রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনা? বাংলাদেশ বনাম সৌদি আরব?

অপর প্রান্ত প্রশ্নের শেষ খুঁজতে ব্যস্ত হয়তো। সম্ভাব্য উত্তর কোনদিকে নিয়ে যাবে, ভাবছেন হয়তো। উত্তর আসে না।

আমি লিখে যাই, "যদি ইসলাম বনাম অন্য ধর্ম-ই আল্লাহ তাআলার বিচারের মানদণ্ড হয়, কেন সবকিছুতে সবার আগে ধর্মকেই টেনে আনব না আমি? একটু বুঝিয়ে বলবেন?"

এই প্রশ্নের উত্তর পাই না আমি। প্রতীক্ষা বেড়ে চলে। সময় পার হয়ে যায়।

আমি একটি উত্তরের আশায় থাকি শুধু!

২

"জনাব জাভেদ কায়সার! আপনি তো পুরাই মোল্লা হয়ে গেলেন। কিন্তু আগে তো অনেক সামাজিক ছিলেন। কত ভালো কিছু করার চেষ্টা করতেন আগে অনলাইনে। খুব কষ্ট পেলাম আপনার এই ধরনের চেঞ্জ দেখে। আল্লাহ্ হাফেজ।"

এই রকম বিষয়ে ইনবক্সে-আসা প্রচুর মেসেজের মধ্যে সবচেয়ে ভদ্রোচিত ম্যাসেজটি উল্লেখ করলাম।

২০১০-এর মাঝামাঝি সময় থেকে সক্রিয়ভাবে ফেইসবুক ব্যবহার করছি। বাংলায় লেখায় সুযোগ আসবার পরে লেখার মাত্রা বেড়ে গেল। মানুষজনের কথা শুনে এক সময় মনে হলো, জীবনমুখী ও রম্য-লেখাটা একদম খারাপ লেখি না বোধ হয়। আমার লেখা যারা দীর্ঘদিন ধরে পড়েন, তারা একটি পরিবর্তন দেখেন আমার। এই পরিবর্তন একদিনে হয়নি। সময় নিয়ে হয়েছে। এবং অতি অবশ্যই এই পরিবর্তনকে আমি আমার ও আমার পরিবারের জন্য কল্যাণকর মনে করি; আল-হামদুলিল্লাহ।

যখন শুধুই রম্য লিখেছি, তখনও কোনোদিন অশ্লীল কোনো কিছু নিয়ে লেখিনি। অনলাইনে কোনোদিন কাউকে কুৎসিত ভাষায় কিছু বলেছি বলেও মনে করতে পারি না। ভালো না বলুক, 'জাভেদ কায়সার খারাপ মানুষ' অন্তত এই কথা শোনার দুর্ভাগ্য হয়নি আমার কোনোদিন। 'পরিবর্তিত জাভেদ কায়সার' অনেক পরিচিত মানুষজনের ঠাট্টা-তামাশার পাত্র হয়ে গেলাম শুধু লেখার বিষয় পরিবর্তন করার জন্য।

হতাশা, বিস্ময় আর ঘৃণার প্রকাশও কম হয়নি। কাছের অনেকে সন্তর্পণে দূরে সরে গেলেন। অনলাইনে পূর্বের পরিচিতদের কাছে মোটামুটি একঘরে টাইপের একজন হয়ে গেলাম। অবশ্যই এই নিয়ে বিন্দুমাত্র, আই রিপিট, বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ, আফসোস কিংবা অনুশোচনা নেই আমার। তবে কষ্ট আছে অবশ্যই। আমি রক্ত-মাংসের মানুষ, পাথর-জাতীয় জড়ো পদার্থ নই।

সবাইকে শুধু একটি কথা বলব—ভুলের অন্ধকারে দীর্ঘকাল বসবাস করে যদি সত্য কিছু

জানার সৌভাগ্য হয় আমাদের, আমাদের উচিত হবে সেই সত্য আলোর পথ অনুসরণ করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। হাসি-তামাশা করা হবে, বিদ্রুপ শুনবেন কাছের মানুষদের কাছে, অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হবে নিজেকে। থামবেন না যেন। হাঁটতে থাকুন যতক্ষণ-না বিপুল আলোর সামনে পর্যন্ত পৌঁছাবেন।

দীর্ঘদিন অন্ধকারে থেকে ধীরে ধীরে আলোর সামনে এসে দাঁড়ালে চোখ মেলতে কষ্ট হয়। কিছুটা সময় লাগে চোখকে তার স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্য উপযোগী করে তুলতে। তামাশা-বিদ্রুপের প্রতিকূল সময়টিকে চোখ খুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের সাথে তুলনা করুন শুধু। নিশ্চিত থাকুন, আদিগন্ত অবারিত আলোক রশ্মি চোখের সামনে যখন উদ্ভাসিত হবে একটি সময় পরে, ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আমাদের আগমন, বেঁচে থাকা ও সর্বশেষে মৃত্যুর যৌক্তিক কারণ অনুধাবন করবেন আপনি। আর সেই জীবন যাপনের একটি অর্থবহ উপায়ও ভেসে উঠবে আপনার সামনে ইন শা আল্লাহ।

সেই সময়ের মনতৃপ্তির কোনো বর্ণনা দেওয়া কোনো বিখ্যাত লেখকের পক্ষেও সম্ভব না। সুবহানাল্লাহ! সকল প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও স্তুতি একমাত্র মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলার জন্য। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মানুষ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবিদের প্রতি সালাম।

বারাকাল্লাহু লানা ওয়ালাকুম।

ছিড়ে যায় অজস্র শেকল

১

সুবর্ণ এক্সপ্রেসে চেপে চট্টগ্রাম যাচ্ছি। একদল তরুণ-তরুণী যাচ্ছে একই কম্পার্টমেন্টে। উদ্দেশ্য সম্ভবত কক্সবাজার। বেশ আমোদ-ফুর্তি করছে তারা। পুরো কম্পার্টমেন্ট জুড়ে একটা ছুটি-ছুটি আমেজ। ভালোই লাগছে তাদের আনন্দ দেখে। পাশের সিটের আপাদমস্তক ধার্মিক মানুষটি পর্যন্ত মিটিমিটি হাসছেন ওদের খুনশুটি দেখে।

বাধ সাধলেন কম্পার্টমেন্টের একমাথায় থাকা এক মেগাস্মার্ট ভদ্রমহিলা। পেছন থেকে উঠে হেলতে-দুলতে এসে "সস্তা ভাঁড়ামি ও রসিকতা" বন্ধ করার জন্য ব্যাপক চিৎকার করে গেলেন। তরুণ-তরুণীদের "বাবার ট্রেন" কি না, সেটিও যাচাই করলেন।

সূর্যের চেয়ে বালি গরম। মেগাস্মার্ট ভদ্রমহিলার ভয়ংকর চেঁচামেচি শেষ না হতেই 'মাম্মি-মাম্মি' বলতে বলতে ভদ্রমহিলার গিগাস্মার্ট মেয়েও যোগ দিলেন তিরস্কার পর্বে। হাই গ্রিডের কোনো ফ্যামিলি নিশ্চিত। সাকস, অ্যাস, ড্যাম প্রভৃতি বিশেষণের বিস্তর ছড়াছড়ি মা-মেয়ের সম্মিলিত চিৎকারে। থ্রেট শেষ করে একসময় হেলতে দুলতে ফেরত গেলেন নিজেদের সিটে।

মা-মেয়ের থ্রেট করার কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজে পেলাম না আমি। দুই গ্রুপ কম্পার্টমেন্ট এর দুই মাথায়। ইয়াং গ্রুপের আনন্দ-ফুর্তির শব্দ শেষ মাথায় জোরে পৌঁছানোর কথা না। মা-মেয়ের ধুম করে জ্বলে ওঠার কারণ ঠিক বোঝা গেল না।

পাশের সীটের ধার্মিক ভদ্রলোক নামাজ পড়তে যাবেন। আমিও পিছু নিলাম। ভদ্রলোকের

ওজু শেষ হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেনের দুই কম্পার্টমেন্টর মাঝের ছোটো বাথরুমে ওজু করা বেশ কষ্টকর। পা ধোয়ার জন্য বেসিনের ওপরে পা তোলা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। ভদ্রলোককেও পা তুলতে হলো।

কপাল অতি খারাপ আমাদের। ঠিক এই সময়ে মেগাস্মার্ট ভদ্রমহিলা তার গিগাস্মার্ট মেয়েকে নিয়ে নাযিল হলেন। আমি ভদ্রলোকের জন্য দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। ভদ্রলোকের এক পা বেসিনের ওপরে তোলা।

মেগাস্মার্ট + গিগাস্মার্ট মুহূর্তেই চোখ কপালে তুলে টেরাস্মার্ট হয়ে গেলেন। কপাল-ভ্রু কুঁচকে একটানা চিৎকার করে গেলেন দুজনে।

ভদ্রলোক 'মুর্খের মতো ট্রেনের অতি পরিষ্কার' বেসিনটি তার নোংরা, গন্ধযুক্ত পা-ধোয়া-পানি দিয়ে অপবিত্র করে দিয়েছেন কোন সাহসে—চিৎকারের সারমর্ম মোটামুটি এই রকম।

আমি ঘাবড়ে গেলেও ভদ্রলোক ঘাবড়ালেন না। পা ধুতে ধুতেই চমৎকার ইংরেজিতে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন,

- আপনারা দিনে সাধারণত কয়বার মুখ ধুয়ে অভ্যস্ত?

- এটা কী ধরনের প্রশ্ন? দুবার ধুই, কোনো সমস্যা?

গিগাস্মার্ট কন্যা অতি বিরক্ত এ-জাতীয় প্রশ্নে।

ভদ্রলোকের পা ধোয়া ততক্ষণে শেষ। বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে মুচকি হাসি দিয়ে যেই বাণীটি ডেলিভারি দিলেন, তাতে মুহূর্তেই মা-মেয়ে চুপসানো বেলুন!

মেগাস্মার্ট মা + গিগাস্মার্ট মেয়ে = টেরাস্মার্ট ক্র্যাশ করে এখন কিলোস্মার্ট।

"আমি দিনে পাঁচবার ওজু করার সময় যত্ন নিয়ে পা ধুয়ে অভ্যস্ত। সেই হিসাবে আপনাদের মুখের চেয়ে আমার পা অন্তত তিনগুণ বেশি পরিষ্কার। একটু সরে দাঁড়ান, নামাজ পড়তে যাব।"

২

আমার পাল্টে যাওয়ার ঘটনা :

মূল কথা, 'পরিবর্তিত জাভেদ কায়সার' নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম। পরিবর্তন যে একদিনে না হয়ে ধাপে ধাপে হয়েছিল, সেটিও উল্লেখ

করেছিলাম সেখানে। আল-হামদুলিল্লাহ, অনেক ভাই-বোন এই পরিবর্তনের পেছনের ঘটনা জানতে চেয়েছেন। তাদের মূল প্রশ্ন,

কী ছিল সেই ঘটনা, যা নিজের অতীতের ধারণায় ফাটল সৃষ্টি করেছিল?

ভুল বিশ্বাস ও জ্ঞানের শক্ত দেয়ালকে প্রবল ঝাঁকি দেওয়া মূল ঘটনাটি ছিল স্রেফ ফেইসবুকের একটি স্ট্যাটাসকে ঘিরে। ওপরের স্ট্যাটাসটিই সেই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল!

কিন্তু কেন? কী হয়েছিল স্ট্যাটাস দেওয়ার পরে?

প্রথম দিকে সবাই পজিটিভ কমেন্ট করছিলেন। আমি খুশি খুশি মনে কমেন্টের রিপ্লাই দিচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ করেই কিছু নেগেটিভ কমেন্ট আসা শুরু করল। নেগেটিভ কমেন্টগুলো করছিলেন কিছু দ্বীনি ভাই। তারা বলছিলেন, আমার স্ট্যাটাসটিতে বড়ো একটি সমস্যা আছে। ইসলাম ধর্মে হারাম-এমন কাজকে আমি এমনভাবে প্রেজেন্ট করেছি যেটি অতি স্বাভাবিক। যেহেতু আমার ফলোয়ার তখন প্রায় ১৫/১৬ হাজার, এটি আমার ফলোয়ারদের মধ্যে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করছে ও করবে।

এক কথা-দুই কথা থেকে কথা বাড়তেই লাগল। আমি মাথা ঠান্ডা করে অনেক খুঁজেও আমার স্ট্যাটাসে হারাম বা অশ্লীল কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কী অদ্ভুত!

এই কথা সত্যি যে আমি স্ট্যাটাসটি মূলত ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই দিয়েছিলাম। আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম, দাঁড়ি-টুপি-সালাত আদায় করলেই কেউ ক্ষ্যাত হয়ে যায় না। কিন্তু নিজের অজান্তে কী ভুল করেছিলাম, অনেক খুঁজেও বের করতে পারছিলাম না। এইভাবে সারা রাত কেটে গেল।

পরদিন সকালেই ক্ষমা চেয়ে আরেকটি স্ট্যাটাস দিলাম। মনে হচ্ছিল, নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে। তা না হলে এত জন দ্বীনি ভাই (তখন অবশ্য তাদের জঙ্গী ভাবছিলাম, ঠিক যেমন অনেকেই এখন আমাকেও জঙ্গী ভাবে) কেন ভুল হয়েছে বলে কমেন্ট করবেন! তাই কী ভুল করেছি, তা না বুঝলেও ফিতনা সৃষ্টি ও ধৈর্যধারণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে স্ট্যাটাস দিলাম।

আল-হামদুলিল্লাহ, এক ভাইয়ের কল্যাণে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম পরদিন রাতে! আমি ইনবক্সে একটি হাদীস ও হাদীস-সংক্রান্ত একটি বিধান পেলাম।

"আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ ও শেষ-

দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, মাহরামের সঙ্গ ছাড়া তার একাকী এক দিন এক রাতের দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়।”[১২২]

ফিকাহবিদদের সর্বসম্মত মত, “যে-কোনো যুগে, টেকনোলজির পরম উৎকর্ষতার সময়েও এই দূরত্ব ৪৮ মাইল/৮০ বা ৮৩ কিলোমিটার। এই একই দূরত্ব অতিক্রম করার পরে একজন মূসাফির হিসেবে গণ্য হবেন।”

ইনবক্সের ম্যাসেজ পড়ে আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এল। এই হাদীস আমার জানা ছিল না। ট্রেনে কিছু ছেলেমেয়ে একসাথে হাসি-তামাশা করতে করতে ঘুরতে যাচ্ছে, যা কিনা পরিষ্কারভাবে হারাম, আমি এটি পুরোপুরি উপেক্ষা করে গেছি। তার মানে আমি একটি হারাম কাজকে খুব সাধারণভাবে উপস্থাপন করলাম যেন এটি জায়েয একটি বিষয়!

কিন্তু একটু পরেই শয়তান আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মনে হলো, এইটা কোনো কথা হলো যে, একজন নারী মাহরাম ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবে না! ইসলাম তো শান্তির ধর্ম, মানবতা শিক্ষা দেয় ইসলাম, আল্লাহ পাক তো আমাদের জন্য ইসলাম সহজ করে দিয়েছেন, নামায-রোযাই মূল, মনের পর্দা বড়ো পর্দা ইত্যাদি কথা মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। মনে হলো, এখানে বোধহয় কোনো ‘কিন্তু’ আছে। আমি পূর্ণ উদ্যমে হাদীসের ফাঁকফোকর খুঁজতে শুরু করলাম! (নাউজুবিল্লাহ)।

হাদীসের বই ঘাঁটলাম। বিস্তর ফাতওয়ার বই দেখলাম। শয়তানের প্ররোচনায় ৪ মাযহাবের ফাতওয়াও খুঁজলাম, যদি কোথাও কোনো ফাঁক পাই (এভাবেই শয়তান নিজের বিবেক-কে ব্যবহার করার জন্য সূক্ষ্ম চাল দেয়)। পেলাম না কিছু!

শেষে খুঁজে ৫ জন মুফতির সাথে আলাদাভাবে কথা বললাম। তারা সবাই নির্দ্বিধায় জানালেন, শারীআর বিধান এটিই—মাহরাম ছাড়া এই দূরত্বের (৪৮ মাইল/৮০ বা ৮৩ কিলোমিটার) ওপরে কোনো বালেগ মেয়ে একা যাতায়াত করতে পারবে না। এমনকি পবিত্র হাজ্জ পালনের মতো ফরজ বিধান পর্যন্ত শিথিল হয়ে যাবে সেই নারীর জন্য যার কোনো মাহরাম সাথে যাবার মতো নেই! টাকা ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান হলেও সেই নারী একা বা কাফেলার সাথে হাজ্জ পালন করতে যেতে পারবে না!

আল-হামদুলিল্লাহ, অবশেষে আমি নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। বিবেকের প্ররোচনা ধরতে পারলাম। শয়তানের ধোঁকার প্রক্রিয়া টের পেলাম। আমি নতুন করে সেই রাত থেকে ইসলাম ধর্ম বোঝার চেষ্টা শুরু করলাম। মনে হলো, আমি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে হাঁটা শুরু করলাম; সুবহানাল্লাহ!

---

[১২২] বুখারি, ১০৮৮; মুসলিম, ১৩৩৯; তিরমিযি, ১০৭০; আবূ দাউদ, ১৭২৩

আমি নিজের জীবন দিয়ে বুঝলাম, একটিমাত্র 'ফেইসবুক স্ট্যাটাস' কিংবা একটিমাত্র সহীহ্ হাদীসও পারে আমাদের অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে, যদি আমরা ব্যক্তিগত মতামত, জাগতিক জ্ঞানের মানদণ্ডে নেওয়া সিদ্ধান্ত কিংবা সদা-জাগ্রত বিবেক-এর ওপরে মহান আল্লাহ্ তাআলার বিধানকে স্থান দিতে কার্পণ্য বোধ না করি। সর্বোপরি, যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাআলা হিদায়াত নসীবে রাখেন।

আমাকে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর সরল পথ দেখালেন। আল-হামদুলিল্লাহ্।

পুনশ্চ : আমাকে বাতিল থেকে হকের পথে আনায় সাহায্য করার জন্য সেই সব জঙ্গী ভাইদের (!) মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাআলা উত্তম প্রতিদান দান করুক। সাথে আমাকেও সিরাতুল মুস্তাকিমে স্থির ও দৃঢ়পদ রাখুক।

৩

মানুষের বিচ্যুতি হতে পারে। এটি অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু যেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হলো, নিজের ভুলকে স্বীকার করার মানসিকতা। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে হয়, আমাদের আশেপাশের মানুষজন, আমাদের ভাইয়েরা; সেই বিচ্যুতির বিষয়ে তাদের মনোভাব। আমি, মুহাম্মাদ জাভেদ কায়সার, আজ, এই মুহূর্তে যদি দ্বীন ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়ে আমার "নিজস্ব মতামত" পোস্ট আকারে জানাই, তবে দুটো বিষয় হতে পারে।

প্রথম সম্ভাবনা : "গত ১ বছরে এমন পরিপক্ক লেখা ফেইসবুকে পাইনি, অসাধারণ", "ভাই, দুর্দান্ত লিখেছেন", "ভাই, মনের কথাটাই কীভাবে যেন লিখে ফেলেছেন। আল্লাহ্ কবুল করুক"—এই জাতীয় কমেন্টের ভিড়ে আপ্লুত হতে পারি।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা : আমার পোস্টে নিয়মিত কমেন্টকারী, একান্ত কাছের ভাইদের কাছ থেকেই সবার প্রথমে তীব্রতম প্রতিবাদের মুখে পড়তে পারি।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি : দ্বিতীয় সম্ভাবনা সত্য হবার বিষয়ে আমি ৯৯% নিশ্চিত। কেউ ইনবক্সে নাসীহা দেবেন, কোনো ভাই হয়তো কমেন্টেই বলবেন সরাসরি। কুরআন-সুন্নাহ-ইজমা-কিয়াসের বিপরীতে নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি আমার অতি কাছের সেই ভাইয়েরাই সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবেন। আল-হামদুলিল্লাহি তাআলা।

আমার সেই ভাইরা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বিকৃতি ঠেকাতে এই কাজটি করবেন। একইসাথে, আমাকে হিদায়াতের পথে ফিরিয়ে আনার আন্তরিক প্রচেষ্টাও থাকবে

তাদের। সুম্মা আল-হামদুলিল্লাহ। এটিকে আমার রবের পক্ষ থেকে বিশাল একটি নিয়ামাত মনে করি আমি।

বিশ্বাস করুন, তাদের কমেন্ট ও রিফিউটেশনের কারণে আমাকে আপাত অপদস্থ হতে হলেও, ওয়াল্লাহি! আমি সেজন্য খুশি থাকব এবং সব বিষয়েই তাদের এভাবেই পাশে চাইব। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ চাইব, আমৃত্যু যেন তারা তাদের নাসীহার মাধ্যমে সামান্যতম বিচ্যুতি থেকেও আল্লাহর ইচ্ছায় আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

নিজের বিচ্যুতির জন্য "বাহবা" পেয়ে "সম্মানিত" বোধ করার চেয়ে ভুল স্বীকার করে "আপাত অপদস্থ" হওয়া আমার জন্য লক্ষ-কোটিগুণ উত্তম বলেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। কারণ এটি আমাকে "কিয়ামাতের দিন অপদস্থ" হওয়া থেকে রক্ষা করবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা সেই সব ভাইদের কবুল করুক এবং আল্লাহভীরু ভাইদের সাথে, তাদের কাছে-পিঠে থাকার তাওফীক দিক।

উহিব্বুহুম ফীল্লাহি তাআলা।

৪

কয়েক বছর আগের মুহাম্মাদ জাভেদ কায়সার এবং বর্তমান মুহাম্মাদ জাভেদ কায়সার এর মধ্যকার পার্থক্য কী?

মূলত বিশাল কোনো পার্থক্যই নেই। পার্থক্য যদি বলতে হয়, তবে সামান্য একটি 'উপলব্ধি' আমি দ্বীনের বিধানের সামনে নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করতে শিখেছি; আল-হামদুলিল্লাহ।

একটি সময়ে পরিষ্কার বিধান সামনে পাবার পরেও নিজের বিবেক খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিতাম। আমার বুদ্ধি-জ্ঞান-বিবেক দিয়ে নিজের মতের সমর্থনে যুক্তি তৈরি করতাম। অসংখ্যবার শয়তান পাশে থেকে সাহায্য (!) করেছে। মনে হয়েছে—হতে পারে ইসলাম এটিকে হারাম করেছে। কিন্তু ১৪০০ বছর আগের বিধান আর এখনকার বিধানে পার্থক্য আসবে, এটিই স্বাভাবিক। ইসলাম এত কঠোর না। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমার নিয়ত জানেন।

এইভাবেই ফাঁক-ফোকর বের করে নিজের মতের অনুসরণ করতেই দারুণ ভালো বোধ করেছি। সাথে শয়তান তো ছিলই। এক সময়ে দেখলাম, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

উলামাদের সর্বজনীন বিধানের বিপরীতেও যুক্তির পাহাড় দাঁড় করাচ্ছি আমি। একটি-দুটি নয়, আমার ভাণ্ডারে দ্বীনের সুস্পষ্ট বিধানের বিপরীতে শ খানেক যুক্তি মজুদ থাকত!

সেই যুক্তির গোডাউন (পড়ুন শয়তানের আবাসস্থল) থেকে একটি একটি যুক্তি ডেলিভারি দিতাম। একটি না মিললে আরেকটি। সেটি ব্যর্থ হলে আরেকটি। মোটকথা, নিজের বিবেকের বিপরীতে হারতে রাজি ছিলাম না আমি। মহান আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। এই আমি মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে যাবতীয় মনুষ্য-যুক্তির ওপরে দ্বীনের বিধানকে একমাত্র সত্য হিসেবে প্রাধান্য দিতে শিখেছি; আল-হামদুলিল্লাহ।

ওয়াল্লাহি! নিজের চোখকেও অবিশ্বাস করতে পারি আমি, যদি মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীতের কোনো বিষয় যদি হয়। দ্বীনের বিধানের বিপরীতে নিজের মস্তিষ্ককপ্রসূত জ্ঞানকেও ভুল ভাবতে বেশি পছন্দ করি আমি এখন। আমি 'শুনলাম ও মানলাম' থিওরির অনুসারী হতে পেরেছি বোধকরি, যদি বিষয়টি দ্বীনের বিধান-সংক্রান্ত কোনো কিছু হয়।

আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি : আমার ব্রেইন ভুল প্রসেসিং করতে পারে, আমি ভুল হতেই পারি; কিন্তু দ্বীন ইসলাম কস্মিনকালেও ভুল হবে না। আমার বোঝার সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে; দ্বীন ইসলামের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, কিয়ামাত পর্যন্ত সীমাবদ্ধতা থাকবে না।

এখনও যে শয়তান ছেড়ে গেছে আমাকে, তা কিন্তু নয়। বরং প্রতি মুহূর্তে আপাত 'ঘুমন্ত বিবেক'-কে সদা-জাগ্রত বিবেক হিসেবে পুনঃস্থাপনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। মহান আল্লাহর কাছে আমৃত্যু আশ্রয় চাই নিজের মতকে দ্বীনের বিধানের বিপরীতে এক পলকের জন্যও দাঁড় করানো থেকে।

বিনীত অনুরোধ আমার দ্বীনি ভাই-বোনদের কাছে : কখনও যদি এই মুহাম্মাদ জাভেদ কায়সারকে দ্বীনের পরিপন্থী কিছু করতে দেখেন, দয়া করে সতর্ক করবেন। মুসলিম-মাত্রই একে অপরের আয়না। আমাকে পেছনে ফেলে আপনারা একা জান্নাতে যেতে চাবেন না নিশ্চয়ই।

বান্দা আপনাদের দুআর মুহতাজ। জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।

****

ইনবক্সের এই প্রশ্নের উত্তর স্ট্যাটাস আকারে দেওয়ার কারণ শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং আমার মতো সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত ভাই-বোনদের কল্যাণ কামনা। রিয়া-র মতো আমল বিধ্বংসী বিষয় থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আমি জানি না

আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের কথা।

মাগরীব (মরক্কো) থেকে একব্যক্তি অনেক কষ্ট করে প্রায় সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মদীনা পৌঁছলেন। এত কষ্ট করে আসার একটিমাত্রই কারণ। মদীনায় অভিজ্ঞ একজন আলিম আছেন। তাঁর কাছে সর্বমোট ৪০টি প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন তিনি।

একসময়ে আলিম মানুষটির কাছে গিয়ে তার ৪০টি প্রশ্ন রাখলেন মরক্কো-থেকে-আসা মানুষটি। বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলেন তিনি, তার ৪০টি প্রশ্নের ৩৪টি প্রশ্নের উত্তর হিসেবে আলিম মানুষটি একটি কথাই বললেন, "লা আ'লাম; ওয়াল্লাহু আ'লাম—আমার জ্ঞান নেই এই বিষয়ে; এবং মহান আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।"

মরক্কো-থেকে-আসা মানুষটি প্রাণপনে বোঝানোর চেষ্টা করলেন আলিমকে—আমি সেই মরক্কো থেকে মদীনায় এসেছি শুধু আপনার কাছে। আসার কারণও আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা। আপনি কীভাবে আমার ৪০টি প্রশ্নের মধ্যে মাত্র ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বাকি ৩৪টি প্রশ্ন 'আমার জ্ঞান নেই' বলতে পারেন?

আলিম মানুষটি এবারেও অভিন্ন উত্তর দিলেন, "লা আ'লাম; ওয়াল্লাহু আ'লাম। আমার জ্ঞান নেই এই বিষয়ে; আর মহান আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।"

মদীনার সেই নাম আবূ আবদুল্লাহ মালিক ইবনু আনাস ইবনু মালিক। উম্মাহ তাঁকে ইমাম মালিক হিসেবে জানে। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুক।

ইমাম মালিক ফিকহ-শাস্ত্রের অত্যন্ত সম্মানিত মুজতাহিদদের একজন ছিলেন। ফিকহের সম্মানিত প্রধান চারজন ইমামের একজন তিনি। মালিকি মাযহাব তাঁরই প্রণীত মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সংকলিত 'মুয়াত্তা' অত্যন্ত বিখ্যাত এবং প্রাচীন হাদীসগ্রন্থ। অথচ সেই ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ মরক্কো-থেকে-আসা একব্যক্তির ৪০টি প্রশ্নের ৩৪টির উত্তর দিয়েছেন 'লা আ'লাম; ওয়াল্লাহু আ'লাম' বলে! কারণ অতি সহজ। ফিকহ-শাস্ত্র কোনো সামান্য বিষয় নয়। নিশ্চিত জ্ঞান না থাকায় তিনি প্রশ্নগুলোর উত্তর 'আমি জানি না' দিয়েই শেষ করেছেন।

উসূলুল ফিকহ যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে, তাঁদের সবার জীবনেই এই রকম উদাহরণ রয়েছে। নিশ্চিত জ্ঞান না থাকলে 'আমার জানা নেই' বলতে বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় করেননি তাঁরা। প্রাচীন আরবি প্রবাদ আছে একটি—"জ্ঞানী মানুষের জ্ঞানের পরিচয় মিলবে তখনই যখন তিনি অকপটে কোনো বিষয়ে স্বীকার করবেন, 'আমার জ্ঞান নেই' এই বিষয়ে।"

আমি, মুহাম্মাদ জাভেদ কায়সার, সেক্যুলার মাধ্যমে পড়ালেখা করা একজন মানুষ। দ্বীন ইসলামের বিষয়ে আমার প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান শূন্যের ঘরে। অতি সামান্য যতটুকুই জানি, সেটুকু নিজের আরও সামান্য কিছু পড়ালেখার কারণে। যে-কোনো মানুষই জানেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প কোনো কিছুই নেই। দ্বীন ইসলামের জ্ঞানের যখন এই অবস্থা, তখন 'ফিকহি বিষয়ে' আমার জানার অবস্থা কী, সেটি যে-কেউ অনুমান করতে পারবেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাকে অসংখ্য মানুষ ইসলামের বিষয়ে বিশাল জ্ঞানী হিসেবে মনে করেন! একই কারণে অনেকেই ইনবক্সে ও স্ট্যাটাসে আমাকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করেন যার সিংহভাগ প্রশ্নই ফিকহি বিষয়ের সাথে সরাসরি সংযুক্ত। ইনবক্সের কথা ভিন্ন, স্ট্যাটাসের প্রশ্নগুলোর বিষয়ে নিজের জ্ঞান না থাকলে সেই কথাটিই বলে দেওয়ার চেষ্টা করি। অথচ, সুবহানাল্লাহ, কিছু ভাই-বোনদের দেখি ধুম করে সেই প্রশ্নের মনগড়া একটি উত্তর দিয়ে দিতে। বিষয়টি তাদের কাছে নিতান্ত ছেলেখেলা, না হলে এত অনায়াসে উত্তর দিতেন না তারা। দ্বীন ইসলামের একটি বিশেষ শাখা এই ফিকহ। এই বিষয়ে উত্তর দেওয়ার যোগ্যতা সবার থাকে না। আমাদের উলামারা বছরের-পর-বছর উসূলুল ফিকহ নিয়ে গবেষণা করছেন। একমাত্র ফিকহের বিষয়ে জ্ঞান রাখেন ও চর্চা করেন, এমন একজন মুফতি সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার যোগ্যতা রাখেন।

ইনবক্সে 'আমার জ্ঞান নেই'-জাতীয় উত্তরে অধিকাংশ ভাই-বোনেরাই বুঝতে পারেন সীমাবদ্ধতার কথা। সম্ভব হলে তাদের কোনো মুফতি সাহেবের ঠিকানা দিয়ে কিছুটা হলেও

সাহায্য করার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছু ভাই-বোন রীতিমতো জ্বলে ওঠেন তেলেবেগুনে। কোনো এক কারণে তাদের সম্ভবত মনে হয়, 'এই বদ লোক উত্তর জানাসত্ত্বেও বলছে না, ভাব নিচ্ছে বোধহয়। আরেকটু চেপে ধরলে বলবেন।' কিংবা, 'অতিরিক্ত বিনয় দেখাচ্ছেন এই লোক, আসলে সব ভণ্ডামি।' কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'একটু বললে কী হয় ভাই?'-জাতীয় কথাও শুনি।

এতগুলো কথা লেখার মূল অর্থ একটিই। দয়া করে ফিকহি বিষয়সমূহ নিয়ে আমাকে কিংবা অন্য কোনো স্বল্প-জ্ঞানী মানুষকে প্রশ্ন করবেন না। মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করুক, অনেক সময়ে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে নিজের জ্ঞান জাহির করতে গিয়ে, জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ভুল উত্তর দিয়ে দিতে পারি আমি বা অন্য কোনো ভাই। ফলাফল : উভয়েই মহান আল্লাহ তাআলার ক্রোধের শিকার হয়ে গেলাম; মহান আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করুক।

কার কাছে যাবেন তা হলে? কোথা থেকে আপনার প্রশ্নগুলো জানবেন?

আপনাদের আশেপাশে খুঁজলে অবশ্যই কোনো দ্বীনি মাদরাসা পাবেন। সেখানে যান সরাসরি। ইফতা বিভাগের কোনো শিক্ষকের কিংবা একজন মুফতির খোঁজ করুন। ইফতা বিভাগ হলো 'উচ্চতর ইসলামি ফিকহ ও আইন বিভাগ'। আর মুফতি বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যিনি উচ্চতর ইসলামি ফিকহ ও আইন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। তিনি আপনাকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সহীহ উত্তর দিতে পারবেন ইন শা আল্লাহ।

কঠিন হৃদরোগের জন্য আমাদের মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে গিয়ে লাভ হবে না। এলাকার হাতুড়ে ডাক্তার কদম আলী (ডিগ্রি নাই)-এর কাছে গেলে অসুখ ভালো হওয়া দূরে থাকুক, ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর সম্ভাবনাও থাকে।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হোক।

তাঁর মুখাপেক্ষী

১

আল্লাহ তাআলা কিছু বিষয়ে (রিযক, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) পরীক্ষা নিচ্ছেন; আল-হামদুলিল্লাহ। পরীক্ষায় পাশ করব কি না, সেই চিন্তা করার আগে চলুন নিচের ঘটনাটি পড়ি।

মূসা আলাইহিস সালাম মাত্র যৌবনে পা দিয়েছেন তখন।

একদিন শহরে তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াই করতে দেখলেন। এদের একজন ছিল বানী ইসরাঈলের এবং অন্য জন তাঁর শত্রু (ফিরআউনের) দলের। মূসা আলাইহিস সালাম চেয়েছিলেন ফিরআউনের দলের লোকটির হাত থেকে বানী ইসরাঈলের নির্যাতিত লোকটিকে মুক্ত করতে। কিন্তু ঘটনা চক্রে মূসা আলাইহিস সালাম-এর এক ঘুষিতেই মৃত্যুবরণ করে ফিরআউনের দলের লোকটি। তিনি এতে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়ে পড়েন, মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করেন এবং দয়াময় আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন।

পরের দিন ভীত-শংকিত অবস্থায় যখন শহরে এলেন, মূসা আলাইহিস সালাম জানতে পারলেন, ফিরআউনের দলের লোকটিকে হত্যার খবর ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছে শহরে। শেষ পর্যন্ত খবর পৌছে গেছে রাজপ্রাসাদেও । সেখানে ফিরআউনের উপস্থিতিতে সভাসদবর্গের সভাতে মূসা আলাইহিস সালাম-এর জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ধার্য করা হয়েছে।

মূসা আলাইহিস সালাম উপলব্ধি করতে পারলেন যে, রাজপ্রাসাদ বা নগরী এমনকি

ফিরআউনের রাজত্বের সীমানার মধ্যে তাঁর জীবন নিরাপদ নয়। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মিশর ছাড়ার।

কিন্তু কোথায় যাবেন? প্রচণ্ড মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনা তাঁকে অস্থির করে তোলে। শেষে তিনি মাদইয়ান এর দিকে রওনা করেন। দীর্ঘ এই সফরে মূসা আলাইহিস সালাম-এর খাদ্য ছিল গাছের লতাপাতা। সূর্যের প্রচণ্ড তাপের মধ্যে বিশাল মরুভূমি পাড়ি দিলেন তিনি।

সীমাহীন ক্লান্ত, ক্ষুধার্থ, তৃষ্ণার্ত ও আশ্রয়হীন মূসা আলাইহিস সালাম যখন মাদইয়ানের উপকণ্ঠে পৌঁছলেন, শরীরের সব শক্তি প্রায় শেষ তখন। কার কাছে যাবেন, কোথায় আশ্রয় খুঁজবেন, কী খাবেন, সামনের দিনগুলোতেই বা কী করবেন, কিছুই জানা নেই তাঁর।

নিরুপায় মূসা আলাইহিস সালাম তখন নিচের দুআটির মাধ্যমে পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য-প্রার্থনা করলেন,

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

> "হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।"[১২৩]

এ দুআর পর মহান আল্লাহ তাআলার সাহায্য মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে আসতে বিন্দুমাত্র সময় নেয়নি! সুবহানাল্লাহ!

যে-কোনো বিপদে, শংকায়, সমস্যায় মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য-প্রার্থনা করার জন্য এই অর্থপূর্ণ দুআটি আমল করার চেষ্টা করব আমরা; ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা সহজ করে দিক; আমীন।

২

নিজের গুনাহের পাহাড়ের বিপরীতে কুরআনের কিছু আয়াত এবং কিছু হাদীস পড়লে ভরসা পাই কিছুটা। কিছুটা আশা জাগে মনে। আল-হামদুলিল্লাহ। পরকালের সিদ্ধান্তের বিষয়ে ভয়-মিশ্রিত-আশা মন্দ কিছু নয় ইন শা আল্লাহ।

---

[১২৩] সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ২৪

আল্লাহ তাআলা কিয়ামাত-দিবসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মাতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে এনে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে ৯৯টি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন যার প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিছানো থাকবে। তারপর মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন—তুমি কি এগুলো হতে কোনো একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পারো? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার ওপর কোনো জুলুম করেছে?

সে উত্তরে বলবে, না, হে রব!

আল্লাহ তাআলা আবার প্রশ্ন করবেন, তোমার কোনো অভিযোগ আছে কি?

সে বলবে, না, হে আমার রব!

মহান আল্লাহ বলবেন, আমার নিকট তোমার একটি সাওয়াব আছে। আজ তোমার ওপর এতটুকু যুলুমও করা হবে না।

তখন ছোটো একটি কাগজের টুকরো বের করা হবে। মহান আল্লাহ তাকে বলবেন, (কাগজের টুকরোটি নিয়ে) দাড়িপাল্লার সামনে যাও।

সে বলবে, হে রব! এতগুলো গুনাহের খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কী আর ওজন হবে?

আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার ওপর কোনো রকম যুলুম করা হবে না।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারপর সব (৯৯টি) খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং কাগজের টুকরোটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওজনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে।

সুবহানাল্লাহ! কী লেখা থাকবে সেই ছোট্ট কাগজের টুকরোতে?

তাতে লেখা থাকবে—আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

আর আল্লাহ তাআলার নামের বিপরীতে কোনো কিছুই ভারী হতে পারে না।[১২৪]

আল্লাহু আকবার। ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

---

[১২৪] তিরমিযি, ২৬৩৯; ইবনু মাজাহ, ৪৩০০

মুছে যায় সব রঙ

১

শেষ কবে কোনো মৃত ব্যক্তির সাথে কবরস্থানে গিয়েছেন আপনি? একটু মনে করে দেখুন। মৃত ব্যক্তি যদি আমাদের পরিবারের কেউ না হয়, তা হলে খুব একটা বিচলিত হই না আমরা। খুব স্বাভাবিকভাবেই মৃতের সাথে কবরস্থানে যাই। মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন হয় একদিকে। আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার বিষয় নিয়ে হাসি-তামাশায় মেতে উঠি। ঘুণাক্ষরেও মনে আসে না আমাদের, ঠিক একইভাবে আমাদেরও আসতে হবে এখানে। কে জানে, হয়তো আজকেই!

জানাযা শেষ করে যখন খাটিয়ায় তুলে নিয়ে দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, মৃত ব্যক্তির অবস্থা কেমন থাকে তেমন?

আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রেখে লোকেরা যখন কাঁধে বহন করে নিয়ে যায়, তখন সে (মৃত ব্যক্তি) নেককার হলে বলতে থাকে—আমাকে (দ্রুত) এগিয়ে নিয়ে চলো, আমাকে (দ্রুত) এগিয়ে নিয়ে চলো। আর সে নেককার না হলে বলতে থাকে—হায় আফসোস! এটাকে নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মানুষ ব্যতীত সবাই তার এই চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেত তবে অবশ্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত।"

২

দাঊদ আলাইহিস সালাম বলেছেন,

"(হে আল্লাহ) আপনার সূর্যের উত্তাপ আমি সহ্য করতে পারি না, তা হলে আপনার জাহান্নামের উত্তাপ সহ্য করব কীভাবে? রব আমার! রব আমার! আপনার অনুগ্রহবর্ষণকারী আওয়াজ (বজ্রপাত) আমি সহ্য করতে পারি না, তা হলে আপনার শাস্তির আওয়াজ সহ্য করব কীভাবে?"[১২৫]

৩

একটি দোকান খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।

আপনার আশেপাশে একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন। প্রায় নিশ্চিতভাবেই একটি দোকান খুঁজে পাবেন ইন শা আল্লাহ। 'সাঁঝবেলা স্টোর', 'বিদায়বেলা স্টোর', 'শেষ-যাত্রা', 'আখিরাতের সদাই' টাইপের নাম হবে দোকানটির। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে এই দোকান। কাফনের কাপড়, আতর, লোবান, কর্পূর, খাটিয়া, কাফনের বাক্স, কম দামি চা-পাতা, পলিথিন, কসকো মিনি সাবান, গামছা ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যাবে দোকানটিতে।

পূর্ণ এক দিন অবসর নিন—দৈনন্দিন কাজ বা পড়ালেখা থেকে। সকাল সকাল দোকানটির সামনে বসবেন। উঠবেন একদম রাত ১২টার দিকে। যত্ন করে লক্ষ করুন 'সদাইপাতি' কিনতে আসা মানুষগুলোকে। মনে চাইলে মাইয়্যাতের বয়স, ধনসম্পদ, মৃত্যুর কারণও জানতে চাইতে পারেন তাদের কাছে। প্রয়োজন মনে করলে একটুকরো কাগজে লিখেও নিতে পারেন তথ্যগুলো। ভাগ্য নিতান্ত ভালো হলে দোকানটির সাথে লাগোয়া একটি মাসজিদও পাবেন। সেখানে সালাত আদায় করুন সময়মতো। হয়তো কোনো মাইয়্যাতের জানাযাতে শরীক হওয়ার তাওফীকও জুটে যেতে পারে। দিনের সবশেষে জানাযা পড়ানো মাইয়্যাতের স্বজনদের সাথে শরীক হয়ে যান। কেউ মানা করবে না। কেউ জিজ্ঞেস করবে না কিছু। কবরস্থানে দাফনেও শরীক হন। দাফন শেষ হওয়ার পরে বাড়ি ফিরে আসুন।

বাড়ি ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে সারাদিনের কথা বলা মানুষদের কথা একটু ভাবুন। কাগজে কিংবা মগজে টুকে-রাখা তথ্যগুলোর সাথে মিলিয়ে নিন। তারপর ঘুমিয়ে পড়ুন।

ভাইয়েরা! এই একটি কাজ করে দেখতে পারি আমরা।

আমাদের মধ্যে যাদের দুনিয়াবি ভালোবাসা প্রকট, অতিরিক্ত সহায়-সম্পত্তি-প্রীতি ক্রমাগত বেড়েই চলছে যাদের, তাদের জন্য বড়ো উপকার হবে কাজটিতে ইন শা আল্লাহ।

[১২৫] আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, ৩৩৫

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন—নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।

৪

মানুষটি মারা গেছেন ঘণ্টা দেড়েকের কিছু সময় আগে। অথচ শরীর কী অদ্ভুত রকমের ঠান্ডা। এরই মধ্যে সবাই নাম না ধরে 'লাশ' বলে সম্বোধন করা শুরু করে দিয়েছে। জাগতিক বাস্তবতা বুঝি একেই বলে।

মানুষটির শুয়ে থাকা দেখে অবশ্য বোঝার উপায় নেই যে তিনি মারা গেছেন। সফেদ সাদা কাপড় বিছানায় পাতা। তার ওপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে মানুষটিকে। বাহির থেকে কেউ এলে মনে করবেন, ঘুমিয়ে আছেন মানুষটি। একটু জোরে কথা বললেই ঘুম থেকে উঠে বসবেন।

মরা-বাড়ির কোনো আবহ নেই বাসায়। যাদের কাঁদার কথা, তারা একদম নিশ্চুপ। মানুষটির মা-কে কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে পাশের রুমে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। স্ত্রী বসে আছেন স্বামীর মৃতদেহের পাশে। নিশ্চল-নিশ্চুপ। সাড়ে পাঁচ বছরের ছোটো ছেলে আরহাম ঘুরে-ফিরে তার বাবার মৃতদেহ দেখছে। আর কিছুক্ষণ পরপর বাবার কপালে চুমু খাচ্ছে। ঠিক বাবা ঘুমিয়ে থাকলে যা করে। পার্থক্য—শুধু বাবা তার উঠছে না ঘুম থেকে।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে রণে ভঙ্গ দিয়ে আরহাম তার মা'র কোলে ঢুকে বসে রইল।

মরা-বাড়ির বাকি মানুষজন বিব্রত সময় পার করছে। মরা বাড়িকে মনে হবে মাছের বাজার। কবরস্থানের নিরবতা সেখানে অতি শ্রুতিকটু। অতি কাছের মানুষ কান্নাকাটি না করলে বড়ো সমস্যা। তাদের বাদ দিয়ে জোরেশোরে কান্না করা যায় না। হাজিরানে মজলিশে এই নিয়ে কানাঘুঁষা শুরু হয়ে গেছে। সেই কানাঘুঁষার কিছু স্ত্রীর কানেও পৌঁছেছে।

আরও কিছুক্ষণ পরে আরহামকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। মাহরাম আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছেন, তাদের ক্লান্ত গলায় বললেন,

– আপনারা তার গোসলের ব্যবস্থা করুন দয়া করে।

পাঁচতলার ভদ্রলোক পর্দার ওপাশ থেকে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

– আত্মীয়-স্বজনদের সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে কি ভাবি?

– আমি নিজেই খবর দিচ্ছি ভাই। আপনারা গোসলের বন্দোবস্ত করুন। বাদ যোহর জানাযা হবে ইন শা আল্লাহ। দাফন ক্যান্টমেন্ট কবরস্থানেই হবে। দয়া করে ব্যবস্থা করুন আপনারা। মানুষটি বেঁচে থাকতে অসংখ্যবার বলে গেছেন, মারা যাবার পরে যত দ্রুত সম্ভব দাফন করতে তাকে। দেশের বাড়ি নিয়ে যেতে মানা করে গেছেন বারবার। মরা-বাড়ির কান্নাকাটির শব্দ তার কখনোই পছন্দ ছিল না। আমি শুধু চেষ্টা করছি খেলাচ্ছলে-বলে-যাওয়া তার কথা রাখতে।

একটানা কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। তার অনেক কাজ বাকি এখনও। সবাইকে খবর দিতে হবে। 'বাদ যোহর জানাযা' এবং 'ঢাকা শহরেই কবর'—এই দুটো বিষয়ে সবাইকে রাজি করাতে হবে; যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে। ভেঙে পড়ার কিংবা শোক-প্রকাশের অনেক সময় পাওয়া যাবে। আগে তো মানুষটির ওয়াসিয়াত মতো 'বিদায়' নিশ্চিত করতে হবে তার।

পাহাড়-সমান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মোবাইল নিয়ে বসলেন তিনি। অনেক কাজ বাকি, অনেক কাজ!

****

মুহাম্মদ জাভেদ কায়সারের দাফন শেষ হলো বিকেল তিনটায়। সাড়ে তিন হাত মাটির ভেতরে নিজের কাফনের কাপড় ছাড়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটিমাত্র সুন্নাহ নিয়ে গেলেন মুহাম্মদ জাভেদ কায়সার : বুক-সমান কাঁচা-পাকা কোঁকড়ানো দাড়ি।

কাঠফাটা দুপুরে কোথা থেকে যেন রাজ্যের মেঘ এসে হাজির হলো। দাফনের পর পরেই ঢাকার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। আরহাম মায়ের কোল থেকে দূরে সদ্য-দাফন-করা বাবার কবরের ওপরে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়া দেখছে।

ছোট্ট আরহাম শুধু জানে না, তার দাদার দাফনের পরও ঠিক এভাবে কেঁদেছিল আকাশ!

মৃত্যুর মতো ধ্রুব সত্যকে নিজেকে স্মরণ করানোর প্রয়োজন।

বারবার! আগামী ক্রিসমাসে বেঁচে থাকলে মরিশাসে ট্রাভেল করে কী কী করব, সেটি নিয়ে লিখতে পারলে (যা নিশ্চিত হবে, এমন সম্ভবনা ১%ও নেই), নিজের মৃত্যু নিয়ে (যা না হবার সম্ভবনা বিন্দুমাত্রও নেই) কেন লিখতে পারব না আমরা?

মৃত্যুকে স্মরণ করুন বেশি করে। এটি দুনিয়ার প্রতি মোহ বিনষ্টকারী ও হৃদয় কোমলকারী।

ভালো মৃত্যুর বেশ কিছু লক্ষণ

জন্মের পরে প্রত্যেক মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়ো সত্যটি হচ্ছে মৃত্যু।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

"অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মরতে হবে।"[১২৬]

মুমিন-মাত্রই 'হুসনুল খাতিমা' বা 'ভালো মৃত্যু' আশা করে। ভালো মৃত্যু মানে, মৃত্যুর পূর্বে পরাক্রমশালী আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেককারী গুনাহ হতে বিরত থাকতে পারা, পাপ হতে তওবা করতে পারা, নেকির কাজ ও ভালো কাজ বেশি বেশি করার তাওফীক পাওয়া এবং এ অবস্থায় মৃত্যু হওয়া।

আনাস বিন মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ যদি কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন তাকে (ভালো) কাজে লাগান।" সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে (ভালো) কাজে লাগান?' তিনি বললেন, "মৃত্যুর পূর্বে তাকে ভালো কাজ করার তাওফীক দেন।"[১২৭]

ভালো মৃত্যুর বেশকিছু লক্ষণ আছে। এর মধ্যে কোনো কোনো লক্ষণ শুধু মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারে এবং কোনো কোনো লক্ষণ অন্যান্য মানুষও জানতে পারে।

মৃত্যুকালে বান্দার নিকট তার ভালো মৃত্যুর যে আলামত প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে- বান্দাকে মহিমান্বিত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের সুসংবাদ দেওয়া হয়।

[১২৬] সূরা আ ল ইমরান, ০৩ : ১৮৫
[১২৭] আহমাদ, ১১৬২৫; তিরমিযি, ২১৪২

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে; নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হোয়ো না, দুঃখ কোরো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।"[১২৮]

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালোবাসে আল্লাহও তার সাক্ষাৎকে ভালোবাসেন। যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রিয়, আল্লাহর নিকটও তার সাক্ষাৎ প্রিয়।" আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর নবি! আপনি কি মৃত্যুর কথা বোঝাতে চাচ্ছেন? আমরা তো সবাই মৃত্যুকে অপছন্দ করি।' রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "না, সেটা না। মুমিন বান্দাকে যখন আল্লাহর রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি, তাঁর জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে ভালোবাসেন। আর কাফির বান্দাকে যখন আল্লাহর শাস্তি, তাঁর অসন্তুষ্টির সংবাদ দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।"[১২৯]

ভালো মৃত্যুর লক্ষণ রয়েছে কিছু। উলামাগণ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে নিচের লক্ষণগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

(১) মৃত্যুর সময় 'কালিমা' পাঠ করতে পারা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৩০]

(২) মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম বের হওয়া

বুরাইদা ইবনু হাসিব রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমিন কপালের ঘাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।"[১৩১]

---

[১২৮] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩০
[১২৯] বুখারি, মুসলিম
[১৩০] আবূ দাঊদ, ৩১১৬
[১৩১] আহমাদ, ২২৫১৩; তিরমিযি, ৯৮০; নাসাঈ, ১৮২৮

(৩) জুমুআর রাতে (বৃহস্পতিবার রাতে) বা দিনে মৃত্যুবরণ করা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণ করে, দয়াময় আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে নাজাত দেন।"[১৩২]

(৪) মহিমান্বিত আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে কোরো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে।"[১৩৩]

(৫) প্লেগ রোগে মারা যাওয়া

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্লেগ রোগে মৃত্যু প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য শাহাদাত।"[১৩৪]

(৬) যে-কোনো পেটের পীড়াতে মৃত্যুবরণ করা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি পেটের পীড়াতে মৃত্যুবরণ করবে সে শহীদ।"[১৩৫]

(৭) কোনো কিছু ধসে পড়ে অথবা পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "পাঁচ ধরনের মৃত্যু শাহাদাত হিসেবে গণ্য। প্লেগ রোগে মৃত্যু, পেটের পীড়ায় মৃত্যু, পানি ডুবে মৃত্যু, কোনো কিছু ধসে পড়ে মৃত্যু এবং আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া।"[১৩৬]

(৮) সন্তান জন্মের সময় প্রসূতির মৃত্যু অথবা গর্ভবতী অবস্থায় নারীর মৃত্যু

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে নারী বাচ্চা নিয়ে (পেটে কিংবা জন্মের সময়) মারা যায়, তিনি শহীদ।"[১৩৭]

(৯) আগুনে পুড়ে এবং যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর রাহে নিহত

---

[১৩২] আহমাদ, ৬৫৪৬; তিরমিযি, ১০৭৪
[১৩৩] সূরা আ ল ইমরান, ০৩ : ১৬৯
[১৩৪] বুখারি, মুসলিম
[১৩৫] মুসলিম, ১৯১৫
[১৩৬] বুখারি, ২৮২৯; মুসলিম, ১৯১৫
[১৩৭] আবূ দাউদ, ৩১১১

হওয়া শাহাদাত, প্লেগ রোগে মারা যাওয়া শাহাদাত, পানি ডুবে মারা যাওয়া শাহাদাত, পেটের পীড়ায় মারা যাওয়া শাহাদাত, সন্তান প্রসবের পর মারা গেলে নবজাতক তার মাকে নাভিরজ্জু ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"[১৩৮]

(১০) নিজের ধর্ম, সম্পদ ও জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার দ্বীন (ইসলাম) রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ।"[১৩৯]

(১১) জিহাদে প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) একদিন, একরাত পাহারা দেওয়া একমাস দিনে রোজা রাখা ও রাতে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর যদি পাহারারত অবস্থায় সে ব্যক্তি মারা যায় তা হলে তার জীবদ্দশায় সে যে আমলগুলো করত সেগুলোর সাওয়াব তার জন্য চলমান থাকবে, তার রিযকও চলমান থাকবে এবং কবরের ফিতনা থেকে সে মুক্ত থাকবে।"[১৪০]

(১২) নেক আমলরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি কোনো একটি সদাকা করল এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৪১]

এই লক্ষণগুলো আমাদের মধ্যে মানুষদের ভাল মৃত্যুর সুসংবাদ দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

মহিমান্বিত আল্লাহ আমাদের সকলকে ভালো মৃত্যু দান করুন। আমীন।

---

[১৩৮] তারগীব ওয়াত তারহীব, ১৩৯৬
[১৩৯] বুখারি, ২৪৮০; মুসলিম, ২৪৮০
[১৪০] মুসলিম, ১৯১৩
[১৪১] আহমাদ, ২২৮১৩

হারিয়ে-পাওয়া

১

আমাদের মধ্যে যিনি এসএসসি পাশ করেছেন, তিনি নিজের পড়ালেখা চালিয়ে নিয়ে এইচএসসি পাশ করতে চান। যিনি মাস্টার্স পাস করেন, তিনি চান পিএইচডি করতে। ডেপুটি ম্যানেজার নিজের দক্ষতা অর্জন ও প্রকাশের মাধ্যমে ম্যানেজার হতে চান। লে. কর্নেল সাহেব কাজে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি চান। লাখপতি চায় কোটিপতি হতে, মিলিয়েনিয়ার হতে চায় বিলিয়েনিয়ার।

মানুষ-মাত্রই উন্নতি চায়। সেই উন্নতি শুরু হয় ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে। পরে পারিবারিক পর্যায় হয়ে সামাজিক পর্যায়ে ছড়িয়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক বিষয়টি আমাদের অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক মনে হয়, যখন সেটি 'ইসলাম-বিষয়ক-উন্নতি' হয়!

প্রতি সপ্তাহে শুধু জুমুআর সালাত পড়া মানুষটি যেদিন থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া শুরু করেন, আমরা বাঁকা চোখে তাকাই। শালীনতার সাথে সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়েটি যদি হিজাব শুরু করেন, আমরা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকি, যেমনটি করি এক সময় ঘুষ-সুদ খাওয়া মানুষটি হঠাৎ এক সকালে ভালো হয়ে গেলে! পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত আদায় করা কেউ স্বাভাবিকভাবেই এরপরে সুন্নাত এবং নফল সালাত পড়া শুরু করেন। আশেপাশের মানুষকে সালাতের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো শুরু করেন। দ্বীনের বিভিন্ন বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সতর্ক করেন। আমরা তাকে 'কাঠমোল্লা' ট্যাগ দিয়ে দূর

থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি।

খেয়াল করুন, মাস্টার্স পাস করা মানুষ কিন্তু পিএইচডি পাশ করাকে খারাপ মনে করেন না। ডেপুটি ম্যানেজার সাহেব ম্যানেজার না হতে পারলেও ম্যানেজার পদ খারাপ, সেটি কিন্তু বলেন না। লে. কর্নেল সাহেব কর্নেল সাহেবকে সম্মান করেন। তিনি কর্নেল হয়ে বিরাট ভুল করেছেন, এটি কিন্তু মনে করেন না।

আমরা নিজেদের দোষে সালাত না পড়তে পারি। তাই বলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কে ভুল, উগ্রপন্থী, বেশি-বেশি বলে সন্দেহ-পোষণ করতে পারি কি?

একইভাবে দ্বীন ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধান পালন না করলেও যারা পালন করেন তাদেরকে উগ্রপন্থী, ঘৃণা সৃষ্টিকারী, জঙ্গী বলতে পারি কি?

খুব জটিল প্রশ্ন করে ফেললাম বোধ হয়...

২

না, আমরা 'মহাপুরুষ' টাইপের কেউ না। অবশ্যই মানবীয় কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে নই আমরা।

টিভিতে-মুভিতে-পথেঘাটে সুন্দরী মেয়ে দেখলে ঘুরে আরেকবার তাকাতে আমাদেরও ইচ্ছে করে। এক সময়ের হার্টথ্রব গায়ক-গায়িকার ভীষণ পছন্দের কোনো গানের অংশ হঠাৎ কোথাও শুনলে ইচ্ছে করে সাথে গলা মেলাই। খেলার দিন আশেপাশের বাসা থেকে ভেসে-আসা স্লোগান আর চিৎকার পারলে টেনে নিয়ে যেতে চায় শরীরটাকে টিভি পর্দার সামনে।

নায্য সময়ের আগে 'আপাত অসম্ভব' কাজটি নিজ দায়িত্ব হিসেবে করে দেওয়ার পরে সামনের কৃতজ্ঞ ভদ্রলোকের উপহার হিসেবে বাড়িয়ে-দেওয়া সাত অঙ্কের ব্যাংক চেক আমাদের লোভকেও নাড়া দেয়। স্ত্রীর পছন্দের স্বর্ণের গহনার কাল্পনিক ছবি মাথার ভেতর এসে ভর করলেও প্রাণপণ ভুলে থাকার চেষ্টা করি। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সাত অঙ্কের সুদের টাকা ছেড়ে দেওয়ার আগ-মুহূর্ত পর্যন্ত চুম্বকের মতো আমাদেরকেও টানে।

এটা তো সুদ না; ইন্টারেস্ট মানে লাভ। এই টাকা দিয়ে মায়ের শখের চার রুমের একতলা বিল্ডিং করে দিয়ে অসীম সাওয়াবের ভাগীদার কেন হচ্ছ না তুমি?—শয়তানের এমন প্ররোচনার বিপরীতে জয়ী হতে অনেক কষ্টই করতে হয় আমাদের।

অফিস শেষে ক্লান্ত আমাদের রিকশার পাশ দিয়ে লক্ষ টাকার গাড়িগুলো যখন ধোঁয়া

উড়িয়ে বের হয়ে যায়, তখন আমাদেরও কিছুটা হলেও আফসোস হয় সকালের সবিনয়ে ফেরত-দেওয়া ঘুষের টাকার জন্য। ঈদের বাজারে সাধ এবং সাধ্যের সীমার মধ্যে যখন ব্যালেন্স করতে পারি না, বড়ো বড়ো শপিং মলের চোখ ধাঁধানো দোকানগুলোর ভেতর থেকে নীতি-বিসর্জন-দেওয়া বন্ধুটির অট্টহাসি তখন আমাদেরও বুকে শেলের মতো এসে বিঁধে।

এতকিছুর পরেও সারা দিনের ক্লান্তির ধকল শেষে একটা সামাজিক মুভি দেখার ইচ্ছাকে গলাটিপে মেরে পরিবারকে নিয়ে ইসলামি আলোচনাই ধীরে ধীরে প্রিয় হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। দিনের শেষে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি আদায়ের চেষ্টায় আল-হামদুলিল্লাহ্ বলতেই তৃপ্তি পাই আমরা আজকাল।

নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি মানুষের মুগ্ধতা এবং নেশা—দুটোই সহজাত এবং আমরা অবশ্যই মানুষ। তারপরেও আমরা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি শুধুমাত্র কয়েকটি কারণে,

মহান আল্লাহ্ তাআলার আযাবকে আমরা ভয় করি। কিয়ামাতের বিভীষিকাময় দিনে আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফাআত কামনা করি। এবং আমরা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কৃত্রিম চাকচিক্যের চেয়ে আখিরাতের অনন্ত সুখকেই প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করি। সপরিবারে মন-প্রাণে লালন করি জান্নাতের আশা।

আমরা বিশ্বাস করি, দুনিয়াকে হয়তো আমাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখিরাতের জন্য।

মহান আল্লাহ্ তাআলা সহজ করে দিক আমাদের প্রচেষ্টাকে। অসংখ্য ভুলে-ভরা আমাদের সামান্য চেষ্টাগুলোর ভুলত্রুটি ক্ষমা করে কবুল করে নিক মহান আল্লাহ।

মধুরেন সমাপয়েত

এক বোন হাজ্জের সময়ে দেখা একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন। "আমরা মীনার ক্যাম্পে পৌঁছালাম ৮ই জুলহিজ্জায়। আমাদের সাথে ছিলেন ১৭ বছর বয়সের এক বোন। যদিও মাত্র ১৭ বছর বয়সী, কিন্তু ওয়াল্লাহি! আমি তাকে অসাধারণ কিছু আমল করতে দেখেছি। আমি তাকে আল্লাহ তাআলার সামনে বিনয়ী, সমর্পিত ও কান্নারত অবস্থায় দেখতাম। সারা দিন ব্যস্ত থাকতেন আল্লাহর যিকর, কুরআন তিলাওয়াত, বিনয়ের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করায়। সেই তরুণী কোনো দুনিয়াবি আলোচনায় সময় নষ্ট করেননি, বরং সারাক্ষণ নিমগ্ন ছিলেন একান্তে আল্লাহর ইবাদাতে।

পরের দিন ছিল ৯ই জুলহিজ্জা; আরাফা'র দিন। আমরা আরাফা-তে আমাদের ক্যাম্পে পৌঁছালাম। আরাফা-তে পৌঁছানোর পরেই আমরা সবাই ক্যাম্পের ভেতর নিজেদের জন্য একটি আরামদায়ক জায়গা খুঁজছিলাম—শুধু ১৭ বছরের সেই বোন ছাড়া। আমরা যখন শারীরিক আরামের জন্য জায়গা খুঁজছি, সেই বোন তখন হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য জায়গা খুঁজে ফিরছিলেন। বোনটি এমন জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, যেখানে কোনো ঝামেলা ছাড়া তিনি তার রবের সাথে নিবিষ্টমনে সময় পার করতে পারবেন। এমন এক জায়গা, যেখানে তিনি তার মহিমাময় রবের সাথে একাকী সময় ব্যয় করতে পারবেন।

মহান আল্লাহর কসম! সেই বোন যোহরের সালাতের পর থেকে আরাফা'র ময়দান ত্যাগ করার সময় পর্যন্ত সেই একটি জায়গাতেই দাঁড়ানো ছিলেন। না তিনি একবারও বসেছেন, না তিনি তার রবের দুআ থেকে নিজেকে হাত নামিয়েছেন। পূর্ণ বিনয় ও একাগ্রতার সাথে তিনি চোখের পানিতে আল্লাহকে ডাকছিলেন। আমি আমার সারা জীবনে এমন বিনয় ও আবেগের সাথে কাউকে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে দেখিনি।

আরাফা ছেড়ে মুজদালিফা'র দিকে রওনা হওয়ার শেষ সময়ে সেই বোনের কিছু কথা আমাকে কাঁপিয়ে দিল। তিনি তার চোখের পানিতে আল্লাহ তাআলা-কে বলছিলেন,

'হে আল্লাহ! আপনি যদি আমার তাওবাহ সত্যিই কবুল করে থাকেন, তা হলে আজকের দিনই যেন আমার জীবনের শেষ দিন হয়।'

আমি বিস্ময়মুখে তাকে দেখছিলাম; এটা কী ধরণের দুআ? এই 'অন্যরকম' তরুণী কী চাচ্ছেন আল্লাহ তাআলার কাছে?

আমরা আরাফা'র তাঁবু ছেড়ে মুজদালিফা যাবার বাসে উঠলাম। ইচ্ছে করেই সে বোনের পাশে বসলাম। বোনটি কিছুটা বিশ্রামের আশায় তার ক্লান্ত মাথা সামনের সিটের পেছন দিকে ঝুঁকিয়ে দিল। সারাদিনের ক্লান্তি তাকে জেঁকে বসারই কথা। থাক, একটু বিশ্রাম নিক তিনি। গাড়ি যখন সূর্যাস্তের সময় আরাফা'র ময়দান ছাড়তে শুরু করেছে, আমার ইচ্ছে হলো—বোনটিকে আল্লাহর রহমতের চাদরে আচ্ছাদিত হবার সুসংবাদ দিই। আমি বোনকে বলতে চাছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিয়ে তাঁর ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেছেন এবং তাঁদের সাক্ষী রেখে আমাদের ক্ষমা করেছেন ইন শা আল্লাহ; যেমনটা হাদীসে এসেছে।

আমি বোনটিকে ডাকলাম। ও অমুক, ও আমার বোন; শুনুন! কিন্তু ১৭ বছর বয়সী সেই বোন কোনো উত্তর দিল না আমার ডাকের।

আমি আবার ডাকলাম, তারপর আবার। নিরুত্তর বোন আমার।

তৃতীয়বার ডাকার সময় আমি তার মাথা ধরে ডাকলাম। আল্লাহু আকবার, আমি টের পেলাম, আমাদের সেই বোন আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে চলে গেছেন এরই মধ্যে। বিনয় ও একাগ্রতার সাথে আরাফা'র ময়দানে দুআ কবুলের সময় যেই দুআ তিনি করেছেন, মহান আল্লাহ তার সেই দুআ কবুল করেছেন। বোনটি তার রবের সাথে মিলিত হয়েছেন সম্পূর্ণ পরিষ্কার আমলনামা নিয়ে; ইন শা আল্লাহ।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করুন এবং সর্বোত্তম (ঈমান ও আমল নিয়ে) অবস্থায় এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার তাওফীক দিন। আমীন।

****

শাইখ ইউনুস কাথরাদা'র ইংরেজি স্ট্যাটাসের ভাবার্থ করার চেষ্টা করলাম। ভুল-ত্রুটি

ক্ষমা করবেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল, এই মর্মস্পর্শী ঘটনাটি সবার সাথে শেয়ার করা...

কী অসাধারণ মৃত্যু; সুবহানাল্লাহ! আমাদের মৃত্যুও যেন এমন গুনাহহীন অবস্থায় হয়। পরিষ্কার, গুনাহহীন আমলনামা নিয়ে যেন রব্বে কারীমের সাথে আমরা মিলিত হতে পারি ইন শা আল্লাহ। আমীন।

نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة

পরিশিষ্ট

মুহাম্মদ জাভেদ কায়সারের ইচ্ছে ছিল অসাধারণ মৃত্যুর। গুনাহহীন, পরিষ্কার আমলনামা নিয়ে নিজের রবের মুখোমুখি হতে চেয়েছিলেন তিনি। হাজ্জের সফরের পর ২০১৯-এর ২৮শে আগস্ট, মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। মৃত্যুর সময় উচ্চস্বরে কালিমা পড়ছিলেন। মক্কাতেই তার দাফন হয়। তার খুব প্রিয় দুটি বইয়ের নাম ছিল—'বাইতুল্লাহ'র মুসাফির' এবং 'বাইতুল্লাহ'র ছায়ায়'। এখন বাইতুল্লাহ'র মুসাফির হয়ে আছেন বাইতুল্লাহ'র ছায়ায়। আমরা আশা করি, মহান আল্লাহ তাআলা তার দুআ, তার স্বপ্ন কবুল করেছেন।

পৃথিবীর পথে পথে অনেক-আঁধার-পেরিয়ে খুঁজে-পাওয়া আলো তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন মানুষের মাঝে। নিজে চারপাশের মানুষদের চিনিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সেই সত্য, শাশ্বত, সরল-পথ। দ্বীন ইসলামকে প্রকৃতভাবে পালন করতে শুরু করার পর তার সব লেখালেখির উদ্দেশ্য ছিল এটুকুই। তার সেই আকাঙ্ক্ষা, তার এই দাওয়াকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের ক্ষুদ্র এ প্রচেষ্টা। আল্লাহ তাআলা এ লেখাগুলোকে মুহাম্মদ জাভেদ কায়সারের জন্যে আমলে যারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন। তার কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন। এ বইটি পরিবর্তিত জাভেদ কায়সারের মতোই আরও অনেকের জন্য অজস্র শেকল ছিড়ে আলোর পথে আসার উপলক্ষ হিসেবে মহান আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমীন।

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মদ জাভেদ কায়সারের জন্ম ঢাকায়, ১৯৭৯ সালের ২৫ শে জুলাই। পিতা সরকারি চাকরিজীবী হওয়ায় শৈশবের একটা বড়ো অংশ কাটে ঢাকার মতিঝিলের এ.জি.বি. কলোনিতে। অন্য আরও অনেকের মতোই ইসলাম শেখার হাতেখড়ি কলোনির পাশের ছোটো মক্তবে। ভালো-ছাত্র হিসেবে ছিলেন শিক্ষকের প্রিয়ভাজন। ছোটোবেলায় নিয়মিত প্রথম হতেন স্কুলের বার্ষিক কিরাত প্রতিযোগিতায়। পিতার ইন্তেকালের পর শিক্ষার এ ধারায় ভাটা পড়ে এবং ধীরে ধীরে অন্য আরও অনেকের মতোই তৈরি হয় দ্বীনের সাথে সুদীর্ঘ দূরত্ব।

শিক্ষাজীবনে মেধাবী ছিলেন, ছিলেন খেলাধুলায়ও পারদর্শী। স্কুল এবং কলেজের (এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে যোগ দেন বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে। ক্যাপটেন পদে থাকা অবস্থায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেনাবাহিনী থেকে অবসরে চলে যান। পরবর্তীকালে প্রাইভেট একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে শুরু হয় তার নতুন কর্মজীবন।

লেখালেখির শখ ছিল কিশোর বয়স থেকেই। টুকটাক লিখতেন স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিনগুলোতে। দীর্ঘ বিরতির পর লেখালেখির জন্য প্লাটফর্ম হিসেবে বেছে নেন ফেইসবুককে। রম্যভিত্তিক এবং জীবনমুখী নানা ঘটনা নিয়ে লেখা দিয়ে অল্প দিনের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এমনই একটি লেখা তার দ্বীন ইসলামে ফিরে আসার উপলক্ষে পরিণত হয়। দ্বীন ইসলামের সাথে নতুনভাবে পরিচিত হবার পর সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করেন ইসলামের ছাঁচে নিজের জীবনকে গড়ে তোলার। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার কারণে নিজের নামের আগে 'মুহাম্মদ' যুক্ত

করে নাম পরিবর্তন করে রাখেন মুহাম্মদ জাভেদ কায়সার। প্রয়োজনীয় ইলম অর্জনের পাশাপাশি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন আমলের দিকে। ব্যক্তি-জীবনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন হালাল-হারাম মেনে চলাকে। নিজের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদের দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যান সতর্কতার সাথে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে বেশ সফলও হন, আল-হামদুলিল্লাহ। পাশাপাশি মনোযোগী হন দাওয়ার কাজে। ফেইসবুক আগের জীবনমুখী আর রম্যরচনার জায়গায় স্থান পেতে শুরু করে তাওহীদের প্রতি আহ্বান। কুরআন এবং সুন্নাহ'র শিক্ষা। এ ছাড়া অফলাইনেও চালিয়ে যান দাওয়ার কাজ। দ্বীনের খেদমতে তিনি ছিলেন সাধ্যানুযায়ী অগ্রগামী।

মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ২০১৫ সালে পরিবার-সহ হাজ্জ করার সুযোগ হয় মুহাম্মদ জাভেদ কায়সারের। প্রথমবার হাজ্জ সফরে দুআ কবুলের স্থান এবং সময়গুলোতে বিশেষভাবে দুটি দুআ করেছিলেন :

১. প্রতি বছর যেন তার হাজ্জ নসীব হয়

২. মক্কা কিংবা মদীনা যেন তার শেষ ঠিকানা হয়।

মহান রাব্বুল আলামীন তার দুআ কবুল করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের নানা চড়াই-উতরাই সত্ত্বেও ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত প্রতিবছর হাজ্জ করার সুযোগ পান তিনি। পঞ্চমবার হাজ্জ সফররত অবস্থায় ২৮ শে আগস্ট দিবাগত রাত্রিতে মারাত্মক হার্ট অ্যাটাকের মক্কায় তার ইন্তেকাল হয় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বাইতুল্লাহ'র প্রতি অসামান্য-ভালোবাসা-লালন-করা মুহাম্মদ জাভেদ কায়সারকে কবরস্থিত করা হয় মক্কায় অবস্থিত 'মাকবারাতু শুহাদা আল-হারাম'-এ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার প্রতি রহম করুন এবং তার লেখাগুলোকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন।

জাভেদ কায়সার। হৃদয়ে এঁকেছিলেন কা'বার ছবি, মদীনার ছবি। অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন প্রিয় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে। নবিজির প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার কারণে নিজের নামের আগে 'মুহাম্মদ' যোগ করে পুরো নাম পরিবর্তন করে ফেলেন।

তারপর থেকে তিনি আমাদের কাছে পরিচিত হন মুহাম্মদ জাভেদ কায়সার নামে।

তিনি আমাদের প্রিয় ভাই, মুহাম্মদ জাভেদ কায়সার রহিমাহুল্লাহ।

স্বপ্ন ঠিক করে দেয় ওরা...
বড়সড় একটা ফ্ল্যাট, সিক্স ডিজিট স্যালারির জব, সুন্দরী বউ, গ্যারাজে লেইটেস্ট মডেলের গাড়ি, বছরে দুবার ট্যুর অথবা সাদা চামড়ার দেশের গ্রিন কার্ড... ব্যস, তুমি সফল।
সততা? আদর্শ? মূল্যবোধ?
ধুর, ভুলে যাও ওসব! ছলচাতুরির চাদর গায়ে জড়িয়ে নাও নির্দ্বিধায়, দুরভিসন্ধির খেলা খেলে যাও শর্তহীনভাবে। সফল হতেই হবে নয়তো তুমি পিষ্ট হয়ে যাবে জন-অরণ্যের-সামাজিকতার-চাপে। তোমার জীবন হবে ষোলো আনাই বৃথা।
আমরা ভুল করি। স্বপ্ন-সুখ ছোঁয়ার মাতাল নেশায় মত্ত হয়ে আর সবকিছুকে দূরে সরিয়ে গৃহপালিত জীবনযাপন করে পার করে দিই মাটির পৃথিবীর এই এক জীবন। সুখ পাই না। যারা লক্ষ্যে পৌঁছে তারাও অবাক হয়ে দেখে সেখানেও সুখ নেই। সুখ তা হলে কোথায়?
কিছু কিছু মানুষ থাকেন ব্যতিক্রম। সুখ, সফলতা, স্বপ্নের আলেয়াকে ঠিকই তারা চিনতে পারেন। স্বপ্ন-বেচা চোরাকারবারিদের মধুর কথাও ভোলাতে পারে না তাদের। ঠিকই তারা চিনে নেন চিরসুখের, চিরশান্তির, চিরসফলতার সেই পথ। সুখ সন্ধানীদের ভালোবেসে চিনিয়ে দেন...
পথিক, সুখ এই পথে, এ পথেই আছে...
কী সেই পথ ?